পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—নং ৩৫

কবি হেমচন্দ্র

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত।

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
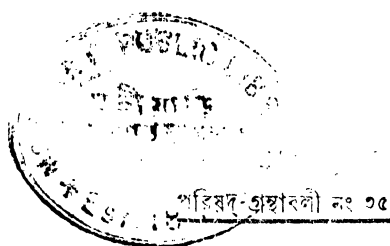
১৩১৮।

কবি হেমচন্দ্র

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত

কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩১৮

মূল্য ৷৷৶০ আনা

৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্,
বাণী প্রেসে
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা
মুদ্রিত।

উপক্রমণিকা

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কীর্ত্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী। কবির কবিত্ব-কীর্ত্তনই কবির জীবনী। প্রধানত সেইরূপ জীবনী লিখিতেই চেষ্টা করিয়াছি। জন্ম-মৃত্যু সকলেরই হয়, অথচ ঐ দুইটি ঘটনাই জীবনের যেন প্রধান ঘটনা বলিয়া আমরা ধরিয়া লই। এরূপ ধরিবার কারণও আছে। ধনী-নির্ধন—পণ্ডিত-মূর্খ—সকলকে লইয়া কালস্রোত সমানে একটানা চলিয়াছে। স্রোত একদিক ভাঙ্গিতেছে, অন্য দিক গড়িতেছে; হয়ত দুই দিকই সমানে ভাঙ্গিতেছে;—কখন বিপুল চড়ার উপর কুলকুল চলিয়াছে, কখন গ্রাম-নগর ভাসাইয়া, প্লাবন করিয়া যাইতেছে—কিন্তু সেই সমান একটানা। এই অনন্ত বাহিনীর কোথায়, কতটুকুর মধ্যে কে গা-ভাসান দিল, কে মুখ তুলিয়া চাহিল, কে লাফালি ঝাঁপানি করিল, তাহা দেখানই জীবনী।

হেমবাবু বা আমরা (আমি হেমবাবুর ৮।১০ বৎসর পরের হইলেও, তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া 'আমরা' বলিতেছিলাম)—হেমবাবু কালস্রোতের যে ভাগে প্রথম দেখা দেন, সেই ভাগ অতি বিষম। কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল; ভাঙ্গিব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল। হেমবাবুর জন্ম-সময়ে (৬ই বৈশাখ, ১২৪৫ সালে) কোন কিছু

ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত। আর এখন, হেমবাবুর মৃত্যু-সময়ে (১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) বোধ হয়, যেন সিকস্তির পর একটু পয়স্তি হইতেছে। ভাঙ্গনের পর যেন একটু অন্যদিকে গড়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাঙ্গন-গড়নের মাঝখানে হেমবাবুর জীবন। পরে দেখিবেন, তাঁহার কবিতাতেও এই ভাঙ্গন-গড়ন কিরূপ ভাবে অনুস্যূত আছে।

ভূমিকা

১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অচির কালমধ্যে কলিকাতায় "হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি রাজশ্রী প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কবি হেমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি সেই বৎসরের মধ্যেই "কবি হেমচন্দ্র" লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করি; তিনি আমাকে ২০০৲ দুইশত টাকা দেন। গ্রন্থের স্বত্ব সমিতিরই হইল,—তাঁহারাই ছাপিবেন বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ইহার দুই বৎসর পরে, আমি কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম, সেই সময়ে রচনাটি চাহিয়া লইয়া একবার দেখিয়া দিয়াছিলাম; সে হইল ইংরাজি ১৯০৫ সালের কথা—তখন স্বদেশীর নূতন সংস্করণ দেশে বড় জাঁকাইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, আরও প্রায় ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ বহু বিলম্বে এই প্রবন্ধ ছাপা হইল। বিলম্বের কারণ আমি জানি না,—তবে বিলম্ব যে হইয়াছে, একথা বলা আবশ্যক; নতুবা স্থানে স্থানে বুঝিতে গোল হইবে।

১১ পৃষ্ঠায় যাঁহার কথায় বলিয়াছিলাম, 'এখনকার সম্রাট্,'—তিনি এখন পরলোকে। ১২ পৃষ্ঠায়, '১৩০৫ সালের ৯ই পৌষ' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'সেদিন বলিলেই হয়,'—এখন ১৩ বৎসরের কথায় আর 'সেদিন' বলা চলে না। ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, 'আঠার বৎসর পূর্ব্বে নবজীবনে যাহা বলিয়াছি',—সে এখন হইতে ২৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, 'কবি-বরের চিতা হইতে এখনও ধূম উদ্গিরিত হইতেছে,'—এখন কিন্তু ওকথা বলা চলে না।

"কবি হেমচন্দ্র" লিখিবার সময়ে কবি নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন। ৪৫ পৃষ্ঠায় ও ৫১ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে জীবিত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি।

একটি ক্ষুদ্র রচনা ছাপা হইতে ৭।৮ বৎসর বিলম্ব হইলে, ঐরূপ বা অনুরূপ দুই চারিটি গোল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু একটি বিশেষ বিড়ম্বনা হইয়াছে—প্রকাশের ব্যবস্থা-বিভ্রাটে।

কথা ছিল, এই রচনাটি আমি অগ্রে সুধীমণ্ডলী মধ্যে পাঠ করিব, তাহার পর অন্থরূপে প্রচারিত হইবে। আমার লেখাটায় আগাগোড়া 'অভিভাষণের' ভাষা, কেবলমাত্র পঠিত হইলে, হয়ত হৃদয়গ্রাহী নাও হইতে পারে। আর একটি কথা বলিলেই এই নীরস ভূমিকা শেষ হয়। এই লেখার দোষ-গুণের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী—সমিতি একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তন করেন নাই।

কদমতলা, চুঁচুড়া।
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

সূচি

কবি হেমচন্দ্র

(অন্ধাবস্থায়)

কবি হেমচন্দ্র

—:**:—

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অতি উচ্চ বংশেই হেমচন্দ্রের জন্ম। দুর্ম্মতিবশত আমরা আভিজাত্যের গৌরব ভুলিতে বসিয়াছি। হেমচন্দ্র রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিলে, হয়ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, তথাপি বলিয়া রাখি, রুদ্ররামের প্রপৌত্র গোলোকচন্দ্র কুলভঙ্গ করেন। হেমচন্দ্র সেই গোলোকের পৌত্র—স্বকৃত ভঙ্গের পৌত্র। এই রুদ্ররামের বংশেই বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ ও হেমচন্দ্র একই পর্য্যায়ের। বন্দ্যঘটী বংশে বাঙ্গালার বিস্তর বড়লোক জন্মিয়াছেন। রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, কবি রঙ্গলাল, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ও

হরপ্রসাদ, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র, জজ গুরুদাস—সকলে এই বংশই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত আভিজাত্য বুঝি আর নাই বুঝি হেমচন্দ্রের যে উচ্চ বংশে জন্ম, তাহা কতকটা বুঝিতে পারি।
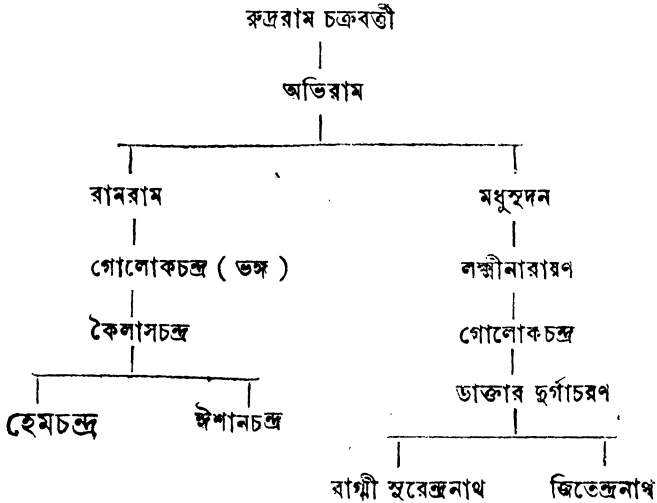
১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলি জেলার গুলিটা গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বার তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হেমবাবু জানিতেন না যে, দুঃখ কাহাকে বলে। তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাপিতাকে লইয়া তাঁহার মাতামহের সংসার; সুতরাং তিনি আদরে লালিত-পালিত হইতেন। তাঁহার কথা তিনি নিজে বলুন না কেন?

"শৈশব সময়, বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানিনা কখন দুঃখ কেমন।

তখন(ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতাপিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে আসি খেলি, সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখে পূর্ণ ধরা, শূন্য সুখে ভরা,
সুখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত, আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের(ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাইলে তাঁরে মনের সাধ,
কখন অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পূরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

● ● ●

কবি হেমচন্দ্র

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সে কালের প্রথা রামায়ণ-গান,
অপরাহ্নে শুনি, মোহিত হয়ে,
সমুদ্র-লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে, বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা-গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি যে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি।

(ষাট্ বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।)

এই যে বাল্যাবস্থায় সুখের স্বাদ,—এটি সৎশিক্ষার বিষম অন্তরায়। আমাদের শাস্ত্রে, সমাজে, এরূপ সুখের স্বাদ একরূপ নিষিদ্ধ ছিল। এখন সমাজ আর শাস্ত্র মানিতে চায় না, কাজেই বাল্যের ব্রহ্মচর্য্য এখন শুদ্ধ বক্তৃতায় বাহবা লইবার সামগ্রী হইয়াছে। এখন নন্দলালকে আমরা একদিকে দুধের গোপাল, মাছের ভোঁদড়,—অন্যদিকে পরিচ্ছদের পুত্তলী, জুতাজামার গোলাম—বানাই। পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়া তাহার

গায়ে দিই—সাবান-পাউডর, হাতে দিই—আয়না-বুরুস, মাথায় দিই—টেড়ি বাগায়ে; তাহাতে নন্দলাল হন, সুখ-সখ-সৌখীনতার একটি অপূর্ব্ব সংযোগ! জানি না, হেমবাবু কৈশোরে কিরূপ জীব হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের সুখ-স্বাদের কথায় এত কথা উঠিল মাত্র।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বি এ পাশ করেন। তখন আর ২।৪টি মাত্র ছাত্র সবে বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন। বি এ, এম্ এ-র এরূপ ফেলা-ছড়া হয় নাই। বি এ ছাপাওয়ালা, বি এ ছবিওয়ালা, বি এ দোকান-দার, খোলার ঘরে দুই টাকা মাহিয়ানায় বি এ টিউটার—এ সকল তখন দেখা দেয় নাই। বি এ ছাত্র তখন মহা গৌরবের সামগ্রী, মাথার মণি। তাহাতে হেমবাবু অতি সুপুরুষ, সদাই হাস্যবদন। উজ্জ্বল চক্ষু প্রভাতের তারার মত জ্বলিতেছে, আধ-ফুটন্ত গোলাপের মত হাসিতেছে। হেমচন্দ্র বিনয়ী, সুরসিক, সুজন, সুসভ্য। এহেন হেমচন্দ্র বিদ্যার গৌরবে মহা গৌরবান্বিত হইলেন।

সম্ভবত বি এ-র পর বৎসর হেমচন্দ্র এল্ এল্ পরীক্ষা দেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ হেমচন্দ্র হাইকোর্টের ওকালতিতে নাম লেখান, কিন্তু তখনও তিনি কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকতা করিতে থাকেন। (রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন) তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চাকরি ত্যাগ করেন এবং সেই বৎসরেই বি এল্ উপাধি পান। ওকালতিতে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল তিনি হাইকোর্টের সিনিয়র উকীল-সরকার হন।

কবিতার ক্রম।

যে বৎসর হেমচন্দ্র হাইকোর্টের ওকালতিতে নাম লেখান, সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়। এই তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ। কি উপলক্ষে, 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র আবির্ভাব এবং হেমচন্দ্রের কবিত্বের প্রথম স্ফূর্ত্তি—সে কথা আমরা পরে বলিব।

পর বৎসর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালা ১২৬৯ সালের ১০ই শ্রাবণ হেমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন-কৃত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিলেন। সমালোচকের আসনে হেমচন্দ্রের সেই প্রথম উপবেশন। একথাও পরে বলিব। বৃদ্ধবয়সে হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া' প্রকাশের সময় আর একবার সমালোচকের আসন গ্রহণ করেন। সেই তাঁহার শেষ সমালোচনা।

১২৭১ সালের ৩১শে বৈশাখ 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হইল। বিজ্ঞাপনে হেমচন্দ্র বলিতেছেন,—

"প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিয়াছি; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিতচিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা-গ্রন্থ-প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয়ত যশের, নয়ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত

যশোলোলুপ যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ-রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল-নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।"

এমন সহজ ভাষায়, সরল ভাবে আর কোন কবি যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। মানুষ চাপল্য চাপিয়া রাখে, যশোলিপ্সা লুকাইয়া ফেলে, হেমচন্দ্র সচ্ছন্দে যে সেই চাপল্য ও যশোলিপ্সাই আপনার সাফাই করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন, এই সরলতাই তাঁহার প্রশংসার কথা। বীরবাহুকাব্যে একদিকে, যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ, ভাষা ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্য-সঞ্চার দেখা যাইতেছে।

১২৭৫ সালে 'এডুকেশন গেজেট' মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হস্তে আসিল। তৎপূর্ব্বে প্যারীবাবুর আমলে, এডুকেশন গেজেটে পদ্য প্রকাশিত হইত। ভূদেববাবু কাগজখানি লইয়া অবধি কয়েক মাস ধরিয়া, উহাতে একটিও পদ্য প্রকাশিত করিলেন না। ১২৭৫ সালের ১৭ই মাঘ, সম্পাদক বড় বড় অক্ষরে বলিলেন যে, এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে। তাহাই হইল; দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের পদ্য এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই দিনই—প্রকাশিত হইল হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ"। তাহার আরম্ভ,—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে"

শেষের দিকে,—

"কতক্ষণে অকস্মাৎ, 'বিধবা হয়েছি নাথ'!
ব'লে, প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।"

এই সকলের সমালোচনা বা জল্পনা অসম্ভব। তবে একথা বলিতে পারা যায় যে, সংবাদপত্রে কবি হেমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব as one crossed in hopeless love.

ঐ ১২৭৫ সালের ১৭ই মাঘ হইতে, ১২৭৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত, এডুকেশন গেজেটে ক্রমে ক্রমে কুড়িটি পদ্য প্রকাশিত হইল। সেইগুলির ক্রম এইরূপ :—

১। ১৭ই মাঘ, ১২৭৫—হতাশের আক্ষেপ
২। ২রা ফাল্গুন ,, —জীবন-সঙ্গীত
৩। ১৬ই ,, ,, —বিধবা
৪। ২৮শে চৈত্র ,, —যমুনা-তটে
৫। ২৬শে বৈশাখ, ১২৭৬—পাখীর প্রতি
৬। ১৬ই শ্রাবণ ,, —লজ্জাবতী
৭। { ২৭শে চৈত্র ,, — / ৩রা বৈশাখ, ১২৭৭ } মদন-পারিজাত
৮। ৩০শে বৈশাখ ,, —জীবন-মরীচিকা
৯। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ,, —ভারত-বিলাপ
১০। ২৫শে আষাঢ় ,, —প্রিয়তমার প্রতি
১১। ৭ই শ্রাবণ ,, —ভারত-সঙ্গীত
১২। ৫ই কার্ত্তিক ,, —গঙ্গার উৎপত্তি

১৩। ২৬শে কার্ত্তিক, ১২৭৭—ভরত পক্ষীর প্রতি

১৪। ৬ই ফাল্গুন ,, —পদ্মের মৃণাল

১৫। ১০ই আষাঢ়, ১২৭৮ —প্রলয়

১৬। ৬ই শ্রাবণ ,, —উন্মাদিনী

১৭। ১০ই ভাদ্র ,, —অশোক তরু

১৮। ২৪শে ,, ,, —কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ

১৯। ৩১শে ,, ,, —ভারত-কামিনী

২০। ২৬শে ফাল্গুন ,, —কালচক্র

এই পদ্যগুলি ভূদেব-পরিচালিত এডুকেশন গেজেটের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া স্থানে স্থানে কবির লেখা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৭৭ সালের প্রথম হইতে কবি জাতীয় জীবন পরিচালনে বদ্ধ-পরিকর। প্রসিদ্ধ "ভারত-সঙ্গীত," বোধ করি, ৭৭ সালের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে। এরূপ পদ্য প্রকাশিত করিতে ভূদেববাবু হেমচন্দ্রকে নিরস্ত করেন। কবি, কোন উত্তর না দিয়া "ভারত বিলাপ" লিখিলেন। তাহাতে আক্ষেপ করিলেন :—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার ;"

কবির আক্ষেপে সম্পাদকও আক্ষিপ্ত হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত করিলেন। তখন ভারত-সঙ্গীতের শীর্ষস্থলে, "ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের" ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ছিল না। কবিতার মধ্যেই শিবজীর নাম ছিল—এখন নাই।

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি
শিবজি, নয়নে হানিয়ে বিজলি"—

এইরূপ ছিল। এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

সে সকল কথা পরে বলিতেছি। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্যটির অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদক রবিন্‌সন যবন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন foreigner, আর শিবজীর স্থানে লিখিলেন Sewji. ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন,—কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়? ভূদেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিতাতে ঐতিহাসিক ভারতবাসীর এক সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা প্রেরিত-স্তম্ভে স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা কিরূপে বুঝিব? Shivajir নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, অনুবাদক Sewji করিয়া গোল করিয়াছেন। বিশেষ, যবন শব্দে মুসলমান; অনুবাদক foreigner করিয়া আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে অনুবাদক বেচারাকে ত্রুটি-স্বীকার করিতে হইল।

২৪শে ভাদ্র, ১২৭৮ "কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ" গেজেটে প্রকাশিত হইল। এখন নাম হইয়াছে "কুলীন মহিলাবিলাপ"। পর সপ্তাহেই প্রকাশিত হইল "ভারত-কামিনী"। তাহাতে এখন আছে,—"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার" ইত্যাদি, কিন্তু এডুকেশন গেজেটে এ সকল কিছুই ছিল না। এখন কুলাঙ্গার শব্দ ৩।৪ বার আছে, তখন একবারও ছিল না। ইহাতে বুঝা যায়, ভূদেববাবু যে কেবল সমীচীন সম্পাদক এমন নহেন, প্রত্যুত তাঁহার স্বজাতিভক্তি আক্রোশ বা আড়ম্বরের সামগ্রী নহে, হৃদয়ের সহজ অবস্থা। ভূদেববাবুর সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া, আমরা এই সকল কথার সমালোচনা পরে বিস্তারিত রূপে করিয়াছি 'আশাকানন' ও 'ছায়াময়ী'র ঠিক সময় নির্ণয় করিতে পারি নাই। ৭৮ সালে গেজেটে লেখা বন্ধ হইল; ৭৯ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত

হইল। হেমবাবু বঙ্গদর্শনে লিখিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রকাশিত হইল—'কামিনী কুসুম'।* তাহার পর 'দেবনিদ্রা' অসম্পূর্ণ। সেই যে অসম্পূর্ণ, আজিও অসম্পূর্ণ,—কালিও অসম্পূর্ণ। বঙ্গদর্শনে হেমবাবু গদ্য-প্রবন্ধ লেখেন—"মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়?"† ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল, জ্যৈষ্ঠমাসে 'অন্নদার শিবপূজা', ভাদ্র মাসে, মধুসূদনের মৃত্যুতে 'স্বর্গারোহণ,' আর চৈত্রমাসে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে 'ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।'

বঙ্গদর্শনে ৮১ সালের আষাঢ়ে প্রকাশিত হইল, "কমলবিলাসী"। ঐ সালের ১৮ই পৌষ প্রকাশিত হইল—অর্দ্ধ 'বৃত্র-সংহার'। সেই অর্দ্ধ কাব্যের সুদীর্ঘ সমালোচনা, মাঘ-ফাল্গুনে বঙ্কিমবাবু করিলেন। কবিকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন চপলার সহিত বজ্রের বিবাহ দেন। বৃত্র-সংহারের অপরার্দ্ধে সে অনুরোধ রক্ষা হইয়াছে। বর্ষীয়সী চপলার সহিত শিশু বজ্রের অপূর্ব্ব সংমিলন হইয়াছে। দেবলীলায় সকলই হয়, এমন শুনিয়াছি মানবলীলায় কুলীনের ঘরে নাকি পূর্ব্বে ওরূপ ঘটনা হইত। তা যাহাই হউক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ,—ও সকল কথায় আমাদের না থাকাই ভাল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১২৮২ সালে) তখনকার যুবরাজ (এখনকার সম্রাট) ভারতে আগমন করেন। সেই উপলক্ষে 'ভারত ভিক্ষা' লিখিত হয়। ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণে 'দশমহাবিদ্যা'র প্রকাশ। ১৩০১

---

* "অধরে অমিয় ধরে, হৃদে পূরে বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম পাব কোথা ললনা।"

'কামিনী কুসুমে'র এই কথা পাঠক মহাশয়গণকে পরে স্মরণ করিতে হইবে।

† হেমবাবুর গ্রন্থমধ্যে এটিও যেন সন্নিবেশিত করা হয়, ইহাই আমার অনুরোধ।

সালের ১৮ই ফাল্গুন, হেমবাবু তখন পীড়িত ও শয্যাশায়ী, 'রোমিও-জুলিয়ত" প্রকাশিত হইল। ১৩০৫ সালের ৯ই পৌষ, সেদিন বলিলেই হয়, হেমবাবুর চিত্তের অভিনব বিকাশ 'চিত্ত-বিকাশ' প্রকাশিত হইল। চিত্ত-বিকাশের দুইটি কবিতা আমাদের মর্ম্মদাহন করে। হেমচন্দ্রের দুঃখে আমাদের দুঃখ। একটি কবিতা—'হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন', অন্যটি 'বিভু কি দশা হবে আমার ?'

হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।

হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন ;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন।
ছিল সুরসাল কাণ্ড, সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা-শাখী চারিধারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপ-তাপ হইত বারণ।
পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক ভ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারায়ে স্ববল
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশি ভূতল।
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ-পত্রিকা,
খসিয়া পড়েছে ভূমে আশ্রিত লতিকা।
শুষ্ক ফল-পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায় ;
আস পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়,

নিরাশ্রয় ভগ্ন নীড় নিকটে না যায়।
পথিক সতৃষ্ণ নেত্রে পথ পানে চায়,
ছায়া বিনা কেহ সেথা বসিতে না পায় ;
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্ব কথা ব'লে ব'লে পথে চলে যায়।
দেখিয়া তরু রে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার (ও) আগে সবই তোর সম,
শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা-লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই,—অনন্ত উপায়
যে এসেছে আশা করে, দিয়াছি তাহায় ;
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন ;
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।

বিভু কি দশা হবে আমার ?

বিভু কি দশা হবে আমার ?
একটী কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র ক'রে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।
চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।
কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্।
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন
ক'রে ভবে রাঁধিয়া রাখিলে।

জীবের বাসনা যত, সকল(ই) করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার
চির অস্তমিত দিনমণি।

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার ;
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?
প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,

আমার রজনী শেষ, হবেনা কি ? হে ভবেশ !
জানিব না দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে !

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব-বদন,

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না !

অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই ?
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকল(ই) হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?

এই সকল ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়; ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্রের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়াছে। তিনি অমরধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সেই সময়ে সুকবি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কবিবরের 'সৎকার' করিবার ব্যবস্থা করেন। সেই কবিতাটি কবির শেষ জীবনের করুণ ইতিহাসের উপসংহার ভাবে আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

সৎকার *

১

বল হরি হরিবোল হরি হরি বোল।
ধীরে ধীরে তোল শব কোরো না ক গোল॥
শোয়ায়ে দড়ির খাটে,
নে চল শ্মশান-ঘাটে,

---

*"অমৃত-মদিরা" ১৪০ পৃষ্ঠা।

খেলো ঠাটে ডেলো কাঠে সাজাইয়ো চুলি।
মুখ-অগ্নি কোরো জ্বেলে ভিক্ষাকরা ঝুলি ॥

২

এ নয় সে হেম যেই শাম্‌লা মাথায়।
হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায় ॥
সন্ধ্যায় বৈঠকে যার,
বন্ধুরা দিতেন বার,
প্রভাতে পাতিতে হাত আসিত অনাথ।
বাড়ীতে পড়িত কত হাভাতের পাত ॥

৩

সে হেম অনেক দিন মরিয়াছে আজ।
পূজেছিল বঙ্গ যাঁরে ব'লে কবিরাজ ॥
শিহরি যাঁহার গীতে,
ঘুম ভেঙে আচম্বিতে,
শুনেছিনু কলরব বাঙালী টোলায়।
"জাগ রে ভারতবাসী" বঙ্গবাসী গায় ॥

৪

মানবের কণ্ঠে গান জন্ম দেব-বরে।
শুনেছিল সেই গান অবশ্য অপরে ॥
বুঝিবা জাপানে কেউ,
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ,
'অসভ্য' জাপানী তাই আজি বজ্রপাণি।
পাশ্চাত্য জগৎ মত্ত মহিমা বাখানি ॥

৫

মধুদত্ত মৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে।
বঙ্কিম বসালে যাঁরে দর্পে সিংহাসনে॥
চক্ষু অর্থ নষ্ট ক'রে,
সে হেম গেছে গো ম'রে,
'দুর্ভাগ্য' দানায় ক'রে গ্রহদোষে ভর।
রেখেছিল দেহ খানা এ কয় বছর॥

৬

বিধিরে বুঝায়ে বুঝি আজি সরস্বতী।
পুত্রের প্রেতত্ব নাশি করালেন গতি॥
চুপি চুপি চল ভাই,
খাটে তুলে ঘাটে যাই,
মরা মড়া পোড়াইতে কাজ নাই গোল।
মনে মনে কাঁদ বল ধীরে হরিবোল॥

হেমবাবুর শৈশবের সেই সুখ-স্বাদ, আর যৌবনে কি কৃত্যে, আর কি কবিত্বে, প্রতিপত্তি-প্রসার, আর বার্দ্ধক্যের এই অন্ধ জীবন—একখানি বিলাতি বিষম ট্র্যাজিডার মত,—শোককর, ভয়ঙ্কর অথচ শিক্ষাপ্রদ।

হেমবাবু আপনার সরল সতেজ লেখনীতে নিজ দুঃখ একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছিলেন,—

"কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকল(ই) হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।"—

এ গুলি যেমন স্পষ্টত অতিরঞ্জন, সেইরূপ সর্ রমেশচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সাহায্যকারী জীবনবন্ধুগণ এবং কাশীর ডাক্তার পূর্ণবাবুর মত প্রাণের অনুগত সহোদর এবং জীবনের অনুচর থাকিতে—

"ধন নাই বন্ধু নাই,
কোথায় আশ্রয় পাই !"—

এ সকল কথাও কেবল অতিরঞ্জন মাত্র। হেমচন্দ্রের দারিদ্র্যের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং সরকার বাহাদুর তাঁহাকে বৃত্তি দান করেন; আর ত্রিপুরার মহারাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র প্রভৃতি বহুতর সদাশয় সজ্জন, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। কবি, ধনী হউন, নির্ধন হউন, আমরা কবির নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। সেই ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভের জন্যই স্মৃতি-রক্ষা সমিতির চেষ্টা। আমি আবার দুনা ঋণে ঋণী; সাধারণ ঋণ ত আছেই আমি আবার নিজকৃত কার্য্যে সেই ঋণ দ্বিগুণিত করিয়াছি, আমার উপর হেমচন্দ্রের দাবি বাড়াইয়াছি, আপনাদের অনুমতি লইয়া হেমচন্দ্রের কবিত্বের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সেই ঋণ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিব।

হেমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত।

কিন্তু ভণ্ডামিতে দেশ ভরিয়া উঠিল; সত্য কথা বলা বিষম দায়। আঠার বৎসর পূর্ব্বে "নবজীবনে" যাহা বলিয়াছি, কপালগুণে তাহা এখনও বলা আবশ্যক; কাজেই বলিতে হইতেছে।

"বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচও হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র—বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ—শেলি,—বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালির নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও, তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।

"তবে কি হেমবাবুর কবিতা আমাদের নিজস্ব নহে? আমাদের আদরের সামগ্রী নহে? নিজস্বও বটে, বিশেষ আদরের সামগ্রীও বটে,—কিন্তু একটু কথা আছে।

"তোমার সহধর্ম্মিণী বিরলে বসিয়া একান্ত মনে মখমলের উপর ফুল তুলিয়া একটি সুন্দর টুপি তোমার জন্য তৈয়ার করিলেন। তোমাকে দিলেন, তুমি হাসিতে হাসিতে মাথায় দিলে, হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া দশজন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইলে। সেই টুপিটি তোমার প্রিয়া-স্ব, তোমার নিজস্ব, তোমার কত আদরের সামগ্রী! কিন্তু উলগুলি সমস্তই বিলাতি উল; ফুলগুলি বিলাতি ফুল; চিত্রের বিলাতি লতাটি বিলাতি পেঁচে জড়াইয়া আছে। সেই নিজস্বের ভিতর হইতে একরূপ পরস্ব পর্‌তে পর্‌তে উঁকি মারিতেছে। তাহার পর সেই দশজন বন্ধুবান্ধবকে

লইয়া যখন ভোজনে বসিলে, তখন তোমার গৃহিণী নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া স্বহস্তে পলান্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, গন্ধে গৃহ ভুর্ ভুর্ করিতেছে ; তাহাতেও পেস্তা কিস্‌মিস্ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্যের আবির্ভাব আছে, কিন্তু সে কেবল মস্‌লা বৈত নয়। আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত, সদ্য মাংস—অপূর্ব্ব মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া গৃহিণী অন্নপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিয়াছেন। আর পাকা সোণার বালা দুগাছি ননীর ধাঁজে বসাইয়া সেই যে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে, ধীরে ধীরে পরিবেশন করিতেছেন,—এ সকলি—পদার্থ, প্রকরণ, ভাবভঙ্গি,—আমাদের নিজস্ব। পরস্ব কিছু থাকিলেও নিজস্বের অগাধে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে, নিজস্বের বৃহত্ত্বে তাহা বিলীন হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তেমন ভুর্‌ভুরে পলান্ন না হইলেও, চল্‌চলে মাছের ঝোল ত বটে। তাঁহার কবিতা আমাদের নিজস্বের নিজস্ব, আমাদের আদরের সামগ্রী, আমরা বড় ভালবাসি।

"গৃহিণীর সূচিত ঐ টুপি ফেলিয়া দিয়া, গৃহিণীর পলান্ন বা মৎস্য-সূপ খাইয়া দিন যাপন করিতে বলি না। তবে মাছের ঝোলের স্থানে কট্‌লেট্‌কে আদর করিতে দেখিলে, সত্য সত্যই দুঃখ হয়। দিন দিন কিন্তু তাহাই হইতে চলিল। বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আনাচে কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজি গন্ধী, ইংরাজি ছন্দী, তাহার উল ইংরাজি, তাহার ফুল ইংরাজি, একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে।—দুঃখ হয় না ? তোমাদের হয় ত হয় না। আমাদের কিন্তু হয়।"

ঐ কথাগুলি পাঠ করিয়া, হেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লেখেন। পত্রে কোনরূপ প্রতিবাদ ছিল না, একটু অভিমানের ছায়া ছিল মাত্র। উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না; নাম স্বাক্ষর ছিল না। উত্তরও কিছু দিই নাই। তাহার পর পূর্ব্ব মত দেখা শুনা হইত ; নবজীবনে পূর্ব্ব মত লিখিতেন,

চিরকালই ছোট ভায়ের মত ভাল বাসিয়াছেন। ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া তিনি কিছু মনে করেন নাই। কিছু অন্যায় বলিয়াছি বলিয়া, আমরাও কখন কিছু ভাবি নাই।

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর, আমাদের মনে কিন্তু কেমন একটা খপ্ খপানী হইয়াছে। যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে পুরা সত্য; হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটু সত্যের আভাস মাত্র। সব কথাটা বলা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

হেমচন্দ্রে পরস্ব অবশ্য আছে। থাকিবারই কথা। ভারতচন্দ্রে পারসী কায়দা অনেক আছে; কিন্তু কে তাহা ধরিতে যায়! আর কাহারই বা তাহাতে আটকায়? ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যের জ্ঞান, মান, তাল, লয়-সঙ্গতি সকলই বিলক্ষণ জানিতেন, ও মানিতেন। জানিতেন ও মানিতেন বলিয়া, তিনি সে পক্ষে শক্তিশালী পুরুষ। সেই শক্তি বলে, তিনি বাঙ্গালার ছাঁচে ফেলিয়া, পরস্বকে নিজস্ব করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যার রূপবর্ণনার অন্তরন্তরে পারসী ভাব আছে, কাজেই আমরা সহজে তাহা ধরিতে পারি না। তাঁহার শক্তি বলে সমস্ত ঢাকিয়া গিয়াছে।

হেমচন্দ্র এপক্ষে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও বোধ করি শক্তিধর। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী বাঙ্গলা কবিতার ভাষা, ভঙ্গিরীতি, ছন্দবিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন। অনুশীলনে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রভু-পরায়ণ সেবকের মত সেবা করিতে করিতে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেবকের প্রভুত্ব বড় শক্তি-সম্পন্ন। হেমচন্দ্রের শক্তি আমাদিগকে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করে। তাঁহার শক্তিমন্ত্র বলে আমরা অনেক পরস্বকে নিজস্ব বলিয়াই মনে করি। কিন্তু পাছে পরস্বের ভরে, তাঁহার নিজস্ব নষ্ট হয়, সে আশঙ্কা হেমচন্দ্রের মনে বহু কাল ছিল।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়; ১২৬৮ সালে

হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরেই সেই খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ত্যক্ত সিংহাসনের অভিমুখে হেমচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অথচ কত যত্ন করিয়া, দেশের লোককে বুঝাইয়া পড়াইয়া সেই সিংহাসনে তিনি মধুসূদনকে বসাইলেন। ১২৬৯ সালের ১০ই শ্রাবণ হেমবাবু মেঘনাদ-বধ কাব্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং সেই সংস্করণের উপক্রমণিকায় মধুসূদনের কবিত্বের মহত্ত্ব-প্রচার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমালোচকের আসনে হেমচন্দ্রের এই প্রথম অধিষ্ঠান। ইহার এগার বৎসর পরে—১২৮০ সালে মধুসূদনের মৃত্যু হইলে, বঙ্কিমবাবু লিখিতেছেন ;—"কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন,—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"

বঙ্কিমবাবু রাজটীকা দিলেন ১২৮০ সালের ভাদ্রে। সুতরাং তখন ত হেমচন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী। কিন্তু ১২৮১ সালের পৌষে, বৃত্র-সংহারের প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে, হেমবাবু অতি বিনয়ে, ভয়ে ভয়ে, লিখিতেছেন :—

"শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার ভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থলে যে, ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাব-সঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।"

হেমচন্দ্র সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, ইংরাজিতে অভ্যস্ত বলিয়া দোষ হইবার কথা ; কিন্তু তিনি মাতৃভাষার সেবক-প্রভু বলিয়া তাঁহার সে দোষ অনেক স্থলেই ঢাকিয়া গিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের সহিত হেমচন্দ্রাদির তুলনা করিয়া একটু দুঃখ করা, তা কেবল যে আমি করিয়াছিলাম তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখও করিয়াছিলেন, আমাদিগকে প্রবোধও দিয়াছিলেন। সে কথাও এখানে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

১২৯২ সালের ভাদ্রের প্রথমেই আমরা এখনকার কালের কাব্য ইংরাজি-গন্ধী, ইংরাজি-ছন্দী বলিয়া থটকা তুলিলাম, দুঃখ করিতে লাগিলাম। দুই মাসের মধ্যেই বঙ্কিমবাবুর লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত হইল। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালির মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালি কবি জন্মে না।...কিন্তু খাঁটি জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না ; দেশ শুদ্ধ জোন্‌স্‌ গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালি নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে, যাহা মার প্রসাদ তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালা, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ।.. এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ তাই সংগ্রহ করিলাম।"

কবি হেমচন্দ্র স্বয়ং মার প্রসাদ ভোগী, সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতীর, বঙ্গ-সরস্বতীর বরে, কৃপায়, তিনি পরস্বকে নিজস্ব অর্থাৎ হেমস্ব করিতে পারিতেন। সেই হেমস্ব তিনি আমাদিগকে দান করিয়াছেন। আমরা এখন অধিকারী হইয়া সেইগুলি আমাদেরই নিজস্ব মনে করিতেছি, তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইতেছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরস্বকে নিজস্ব করাই হেমবাবুর একটি কৃতিত্ব।

দেশভক্তির ও ক্রন্দনের নূতন রাগিণী।

হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বধর্ম্ম পালন বা স্বজাতি বাৎসল্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু হেমচন্দ্র জাতিবৈর-জনিত দেশ-ভক্তিতে ভোরপূর। তাঁহার সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যে, এই দেশ-ভক্তির উজ্জ্বলা ছায়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ইহা হৃদয়ের ভক্তি—সখের নহে। প্রাণের,—পরিচ্ছদের নহে।

হেমচন্দ্রের দেশ-ভক্তি কখন রৌদ্ররসে ফুলিয়া উঠে নাই। সেই দেশ-ভক্তি শান্ত, করুণ—বীররসে মাখান। সেই এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

"কি শুনি রে আজি পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হয়?
বৃটিশ শাসিত ভারত ভিতরে
কেন সবে আজি বলিছে 'জয়'।"

বৃটিশ-শাসনের প্রতি এমন শান্ত সুকরুণ কটাক্ষ, জাতিবৈরের এমন প্রশান্ত চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

"কি শুনিরে আজি পূরি আর্য্যদেশ এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়?"

উত্তরে একজন বলিল :—

"আসিছে ভারতে বৃটন্‌-কুমার"।

শুনিয়া আর একজন বলিয়া উঠিল :—

"উঠ মা উঠ মা ভারত জননি
মহিষী-নন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।"

তখন ভারতমাতা বলিতেছেন :—

"কই কোথা বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।
ডাক্ একবার ডাকিস্ যে ভাবে,
আপনার মায়ে, ঘুচা সে অভাবে,
শতবর্ষে যাহা না ছিল পূরণ—
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারত সন্তান ক্রোড়েতে ধর ॥

এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলে ডাক্ হৃদি জুড়ায়।
দেখ, বৎস, দেখ, কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন-মাঝ
কোটী কোটী প্রাণী ঊর্দ্ধ হাত,
বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায় ॥

এই তপ্ত অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রভাতের আশাই হেমচন্দ্রের জাতিবৈর-জনিত দেশভক্তি। তপ্ত অশ্রুতে হৃদয়ের তীব্র জ্বালা দেখা দেয় বটে, কিন্তু তখনই সুপ্রভাতের আশায়, বড় কোমল করুণ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। বিদেশ হইতে হৃদয় ভরিয়া আনিয়া, আপনার সাধের

ত্রিতন্ত্রীতে তীব্র কোমল সুরে সাধনা করিয়া রোরুদ্যমানা ভারতমাতাকে হেমচন্দ্র এই করুণগীতি শুনাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাতেই ধন্য হইয়াছেন; আমরা সেই কথা স্মরণ করিয়াই ধন্য হইতেছি। আমরা কাঁদিতে জন্মিয়াছি, কাঁদিয়াই চলিব; কাঁদিতে নিরস্ত হইব না, কাঁদিতে ভীত হইব না, কাঁদিতে পশ্চাৎপদ হইব না। পর-পদ সেবা কাঁদিতে কাঁদিতেই সুন্দর হয়। ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আশা পুষিতে পারিলে—আর্দ্র হৃদয়ের আশা বড়ই মধুর। ভগবান্ আর্দ্র হওয়াতেই পতিতপাবনী মন্দাকিনী উদ্ভূতা হইয়াছেন। আবার আমাদের আর্ত্ত আর্দ্র হৃদয়ের উষ্ণ অশ্রুধারা যখন শ্রীহরির পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইবে, তখনই ভক্ত ও ভগবানের প্রকৃত সম্মিলন। উহাই সারূপ্য, উহাই সাযুয্য, উহাই সার্ষ্টি। তবে এস ভাই ভয় কি? এস করুণ কণ্ঠে কাঁদি, চিরকাল কাঁদিয়াছি—এখনও কাঁদি। সেই গীতি কবীন্দ্র জয়দেব হইতে এই রবীন্দ্রনাথ—সকলেই কাঁদিতেছেন;—তাঁহাদের সঙ্গে এস আমরাও কাঁদি।

দেশভক্তির ক্রন্দনে কবি হেমচন্দ্র অগ্রণী, বিয়োগবিধুরের ক্রন্দনে বাঙ্গালা ভোরপূর। বৈষ্ণবগণের সুরের কথা এখানে তুলিব না, সে এক অকুল সাগর। সাগরের সহিত তুলনা করিতে পারিব না। ভারতচন্দ্রের কথাই বলি। বিদ্যার বিলাপলহরীর সুর এমন গড়ানে গড়ানে দীর্ঘচ্ছন্দ যে, তাহাতে প্রাণের ভিতরের সুরও গড়াইতে থাকে এবং আমাদিগকে এক দিক হইতে যেন কোথায় লইয়া যায়।

"প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী—
'সুন্দর প'ড়েছে ধরা।' শুনি, বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরা ধরি করি।

কাঁদে বিন্ধ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে নয়নের জলে,
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর রুধির বাণে,
'কি হৈল, কি হৈল!' ঘন বলে।"

এই দশাক্ষর—'প্রভাত হইল বিভাবরী', ইহার অধিক বাঙ্গালী এক নিশ্বাসে বলিতে পারে না। একাবলী হইলে, মধ্যে বিরাম যতি দিতে হয়। দ্বাদশাক্ষরী বা পয়ারে তা দিতেই হয়। বাঙ্গালীর সেই নিশ্বাসভরা যতি লইয়া একটি বিলম্বিত ছন্দ, তাহাতে দুইবার একরূপ তরঙ্গ, পরে দুইবার ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ, শেষে আবার পূর্ব্বরূপ তরঙ্গ। বঙ্গসাগরের তরঙ্গের মত বাঙ্গালীর হৃদয়ের তোলপাড়ের সঙ্গে এক লয়ে গাঁথা। ইহা বিরহের টৌড়ী—তাল সওয়ারি। এখন হেমচন্দ্রে দেখুন। হেমচন্দ্র চিরপরিচিত ত্রিপদী তাল লইয়া মাত্রাচ্ছন্দে কিরূপ আলাপ করিতেছেন ;—

"রে সতি রে সতি, কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥"

ইহার তাল পুরাতন, মাত্রা পুরাতন, সুরটুকু কিন্তু হেমচন্দ্রের নিজস্ব। বৈষ্ণব কবিতে বাঁশরীর সুর মাথান আছে, কিন্তু মহাদেবের এ শোকে শৃঙ্গরব নাই। ভারতের গড়ানিয়া টৌড়ীতে নাই। বিন্ধ্যার কাঁদুনি গীতি—মহাদেবের ক্রন্দনে গর্জ্জন। 'রে সতি রে সতি' এই ছয় অক্ষরেই মহাদেবের সমস্ত বিলাপ। রতি বা বিন্ধ্যা কত কথাই না বলিয়াছেন। অবলম্বন বিভিন্ন, প্রকরণ বিভিন্ন। কাজেই পরিণামও ভিন্ন। এই ক্রন্দনের নূতন রাগিণীও হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

জীব-দুঃখ সমস্যার মীমাংসা-চেষ্টা।

("চিন্তা-তরঙ্গিণী"তে ও "দশমহাবিদ্যা"য়)

এখন একবার দেখা যাউক, হেমচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তির স্ফূর্ত্তি কিরূপে হইল এবং সেই শক্তি ক্রমে কোন পথে চালিত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই অভিনব শিক্ষা-বিভ্রাটের দুইটী শোককর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গেল। ধর্ম্মহীন লক্ষ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষিতের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি আনিল। একই বৎসরের মধ্যে দুইজন 'সুশিক্ষিত' এই অশান্তির আবেগে উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। একজন,—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য। আর একজন,—খিদিরপুরের ৺যোগেন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীশচন্দ্র হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। দুইজনে এক বৎসরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি এ পাশ করেন। শ্রীশচন্দ্রের নিজকৃত উৎকট অকালমৃত্যুতে হেমবাবু প্রথমে অত্যন্ত শোকার্ত্ত, পরে গভীর চিন্তাকুলিত হইলেন। তাহারই ফল—'চিন্তা-তরঙ্গিণী'। এই বিষম চিন্তা-তরঙ্গভরেই হেমবাবুর কবিত্বের প্রথম বিকাশ। কবির বন্ধুবর শিক্ষা-বিড়ম্বনায় সংসার বিষময় দেখিতেছিলেন। এই পৃথিবী—

"সাধু পুরুষের নয়, রহিবার স্থান,
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান।"

এখানে—

"ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা ?
কেনা মিথ্যা বলে ? কেনা করে প্রতারণা ?'

বন্ধুকে হেমচন্দ্র সান্ত্বনা দিলেন ;—

"কি ছার পাপের ঢেউ দেখ ভয়ঙ্কর,
পায়ে ক'রে ঠেলে দাও নিজ বীর্য্য ধর।
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল,
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল,
সেইরূপ সাধুজন সংসার-ভিতরে
বদ্ধমূল স্থিরভাব আপনার ভরে,
কিছুকাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন।"

দুর্ভাগ্যক্রমে 'দশমহাবিস্থার' দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কাব্যের পোষাক-পরিচ্ছদ বড় জাঁকাল; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূচনার সুর—'রে সতি রে সতি!' বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর; সরল অথচ মর্ম্মভেদী। সূচনা সুন্দর,—কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অবোধ্য হইয়া উঠে। কবি, নিজ ইচ্ছামত পুরাণের বর্ণনা ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িয়াছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, তাহা বুঝা যায় না। ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণে 'দশমহাবিস্থা' প্রকাশিত হয়। সেই সালের পৌষ সংখ্যার 'বান্ধবে' দশমহাবিস্থার চব্বিশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী সমালোচনা দেখা দেয়। এই সুদীর্ঘ সমালোচনা, কবিবরের অনুমত্যানুসারে (হয় ত অনুরোধে) দশমহাবিস্থার পরিশিষ্টরূপে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচক দশমুখে দশমহাবিস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। একমাসকাল মধ্যে দশমহাবিদ্যার ভূয়ো প্রচার না হওয়ায়, বঙ্গসমাজের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। আর দশমহাবিদ্যার দর্শন, কবিত্ব কত রকম করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই যথা—"ভৈরবীকে কেন ভক্তি-বিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা

করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রম-হারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতি-দায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র-দলনী?”

সমালোচক আরও বলিতেছেন :—“জ্ঞানময়ী তারাকে ‘লম্বোদরা’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিম্বা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী (ভুবনেশ্বরী) তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ * * * প্রভৃতি কেন? ভক্তিবিধায়িনী ভৈরবীর * * * * স্তন রক্তলেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না, কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবি-সুলভ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেই ভাল হইত।” সৌভাগ্যবানের ত এই সমালোচনা ;— তবু দশটি বিদ্যার ছয়টি বুঝিতে তিনি অক্ষম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি— দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দশমহাবিদ্যার দর্শন-ভাগ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। চন্দ্রশেখর বাবু ‘বঙ্গদর্শনে’ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। দশমহাবিদ্যায় কবির প্রতিভা বিশ্ব-ব্যাপিনী। কিন্তু কেমন করিয়া, কোন্ উপায়ে তিনি বিশ্ব-ধারণা করিলেন, তাহার ধারণা আমাদের কিছুই হয় না। কবিবরের চিতা হইতে এখনও ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। সেই ধূমায়মানা চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। দুঃখ করিতেছি। দুঃখ আমাদের জন্য,— আমরা বুঝিতে পারি নাই ; দুঃখ তাঁহার জন্য,—তিনি বুঝাইতে পারেন নাই।

অথচ হেমচন্দ্রের কবিতা, এখনকার কালের কতকগুলি কবিতার মত, এ বৎসরের এই বর্ষার আকাশের মত, নিয়ত কুহেলী-ভরা নয়। হেমচন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাজিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহার অনেক

কবিতায় ইংরাজির ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ছায়া তাঁহার কাব্যের প্রাঞ্জলতা একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই। তবু যে আমরা দশমহাবিদ্যা বুঝিতে পারিতেছি না—এটা বড়ই দুঃখের বিষয় বৈ আর কি বলিব ?

হেমচন্দ্রের কাব্যের দর্শন, কাব্যের ধর্ম্ম-ভাব অন্যত্র সুস্পষ্ট,—আমরা বুঝিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি বলিয়া আমরা দুঃখ করিলে বঙ্কিমবাবু আমাদিগকে সান্ত্বনা দেন; বলেন :—"ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি।" তাহাতে বুঝিয়াছি, শিক্ষিত বাঙ্গালি যেমন, শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি তদনুরূপই হইবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালি ও হেমচন্দ্র।

এই অবসরে একবার আত্ম-সমালোচনা করিয়া দেখিলে হয় না?—যে শিক্ষিত বাঙ্গালি কিরূপ জীব? শিক্ষিত বাঙ্গালি প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্যবহার-শাস্ত্রের সঙ্গত ব্যাখ্যায় অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে সুবিচার বিতরণ করিতেছেন। বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারে, জগৎ-চক্ষুর কেন্দ্রীভূত হইয়াছেন। দর্শন-হীন দেশে প্রাচীন দর্শনের মহিমা ঘোষণা করিয়া সকলকে স্তব্ধ করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালির এত যে মহিমা, এত যে গৌরব, তবু কিন্তু আপনা আপনির মধ্যে হৃদয়ের অন্তস্তলে একটি সওয়াল লুকাইয়া থাকে—শিক্ষিত বাঙ্গালি কিরূপ জীব? বিনয়ে বলিতেছি, ক্ষমা করিতে হইবে, ঐ বিষম প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিব। শিক্ষিত বাঙ্গালি agnostic অজ্ঞেয়বাদী, শাদা কথায় বিশ্বাস-বিহীন। শিক্ষিত বাঙ্গালির ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, কর্ম্মে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, সমাজে বিশ্বাস নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালির অদৃষ্টে বিশ্বাস নাই, পুরুষকারেও বিশ্বাস নাই; গুরুতে বিশ্বাস নাই, শিষ্যতেও বিশ্বাস নাই।

শিক্ষিত বাঙ্গালির এই অবিশ্বাস হইতে জন্মিয়াছে—দারুণ হতাশ; সেই হতাশ শিক্ষিত বাঙ্গালিকে ছাড়াইয়া ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালিকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

ঐ যে অভিনব 'কাসেলে' মর্ম্মর-হর্ম্ম্যতলে সোফাধিষ্ঠিত সটকা-নল-হস্ত স্বয়ং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, আর এই যে কদমতলার পুকুর পাড়ে, ছিন্ন-বাস, শীর্ণ-বপু, জীর্ণ-প্রাণ তরঙ্গ-দৃষ্টি দরিদ্র যুবা— উভয়ের অবস্থার মধ্যে সুমেরু-কুমেরু-ভেদ থাকিলেও, উভয়েই জানেন, তাঁহারা বড়

দুঃখী—অতি দুঃখী। কলেজে দুঃখ, কোর্টে দুঃখ, ট্রেনে দুঃখের আলাপ, নদীতীরে দুঃখের বিলাপ, দুঃখ নাই কোথায়? সকলই দুঃখ।—দুঃখ আর দুঃখ। শিক্ষিত বাঙ্গালি সকল অবিশ্বাস করিয়া, বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন দুঃখে। সেই বাঙ্গালির কবি, হেমচন্দ্র দুঃখের কাহিনী গাহিয়া জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। 'চিন্তাতরঙ্গিণীতে' হেমবাবু প্রথমেই এই সুর ধরিয়াছেন। নিজে দুঃখী হইয়াও বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়াছেন; কিন্তু সে সান্ত্বনার ভঙ্গি বন্ধুর প্রতি উপদেশে যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভগবৎ-সম্বোধনে সেই সান্ত্বনা কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা এখন দেখুন :—

"ভজরে তাঁহার নাম, খোঁজরে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যম যাঁরে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী।
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া কর নরে।
ঠেল না চরণে ক'রে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে।"

পাপী তাপী ভয়ঙ্কর ভগবানের কাছে কাতরে নিবেদন করিতেছে; যদি কাতরতা দেখাইয়া একটু আধটু দয়া ভয়ঙ্কর দয়াময় হইতে আকর্ষণ করিতে পারে। এই প্রার্থনা যথার্থই শিক্ষিত বাঙ্গালির অনুরূপ। ইহাকেই ত বলে 'কংগ্রেস্'। কাতরতার রব তুলিয়া ভয়ঙ্কর দয়াময়ের দয়াকণা আকর্ষণ।

সকল বিশ্বাস কাটাইয়া বিশ্বাস রহিল কেবল দুঃখে। তাহাতে আবার হেমবাবু জানিতেন, তিনি দুঃখীর দুঃখী—অতি দুঃখী,—

"কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ,
সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, সুখের লহরী চলে,
কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে॥
সহেছি অনেক দিন, স'ব আর কতদিন,
দিনে দিনে ডুবিছি পাথারে।
সত্বর এ প্রাণ হরি', এ দুঃখ ঘুচাও হরি!
এ যাতনা দিওনাক কারে॥"

বহু পূর্ব্বে কবি বলিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন এই দুঃখের বিধাতা ভয়ঙ্কর; ক্রমে বলিতেছেন তিনি শুধু ভয়ঙ্কর নহেন, তিনি নিষ্ঠুর।—

"জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে;
কাল তার আর চিহ্ন মাত্র নাই,
ভেঙ্গে চূরে যেন কোথায় গিয়াছে।
কেন ভগবান্ হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি বাম?
না থাকিতে দাও কিছু কাল তরে,—
যা দেখে পরাণে এতই আরাম?
বিধি, কিহে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে?
কিবা জীব সুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।
এত কিহে সুখ দিয়াছ জগতে?
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই।

দোহাই তোমার তুমি জান ভাল,
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

*　　*　　*

ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।
দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই,—
তাই জিজ্ঞাসিছি এত, ক্ষম হে গোঁসাই!
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চূর।”

তিনি নিজেই ধাঁধা ভাঙ্গিয়াছেন ;—

“হায়রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন,
মানবের সুখকর,　　নয়ন-মানস-হর
করেছেন ভগবান্ ভূতলে সৃজন।
দিবা বিভাবরী যোগে কতই এমন,
শ্রুতি-দৃষ্টি-মনোলোভা,　　সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্বহীন স্বপন যেমন।
আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন
নহে বঞ্চনার তরে,　　শুধুই জুড়াতে নরে,
মায়া-জালে জড়ালেন নিখিল ভুবন।
না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন,
নিন্দা করে এ কৌশলে,　　তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে, তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন॥”

‘চিন্তাতরঙ্গিণী’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘চিত্তবিকাশ’ পর্য্যন্ত হেমবাবু ক্রমেই প্রাচীন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ঈশ্বর অজ্ঞেয়। কিন্তু দুঃখ-

রাশি সম্পূর্ণ জ্ঞেয়। ঈশ্বর দুঃখ-বিধাতা। সুতরাং তিনি নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর; না,—তিনি মহা ঐন্দ্রজালিক। ইন্দ্রজাল প্রবঞ্চনা নহে ইন্দ্রজাল আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবার প্রধান সাধন। এত কথা বলিয়া, হেমবাবু বলিতেছেন, এস তবে তাঁহার মহিমা গান করি।—

"কিছুই না পাই ভবে, আদি অন্ত সীমা,
সকল(ই) আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।"

কিন্তু এই মহিমা-গানেও কবির 'চিত্তবিকাশে' ভীতি বিলুপ্ত হয় নাই ;—

"হেরে বিশ্বরূপ যাঁর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।"

পরিণামে কিন্তু তিনি ব্রজ বালকের মাধুরিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

"কদম্বের তলে মুরলী মুখে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখি নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায় ;
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ
দিয়া সাজায়েছে জগৎ-ভূপ,
হেন কালরূপ আর কি আছে ?
এখন (ও) নাচিছে নয়ন কাছে।

"প্রেম-ভক্তি-পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদিপূর্ণ হয় আলোকে,
এ মুরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয়।"

আমার চোখে চস্‌মা আছে। আমি দিব্য দেখিতেছি,—শেষ চারি পংক্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। হউক, আর নাই হউক, ব্রজবালকে ত আর ভুল নাই। আমাদের শিক্ষিতের আদরের কবি যদি সেই ভয়ঙ্কর মহিমাময় হইতে, ক্রমে 'চিত্তবিকাশে', ব্রজ-বালকের মাধুরিমায় উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে আসুন না ভাই শিক্ষিত সম্প্রদায়! আমরা সকলে কবির পদানুসরণ করিয়া জগতের অনন্ত মাধুরিমায় এই দুঃখ দুঃখ দুঃখ সমস্ত ডুবাইয়া দিই।

মেকির উপর কশাঘাত।

কবি হেমচন্দ্রকে বুঝিবার জন্য পন্থা পরিষ্কার করা আবশ্যক। লাইন্ ক্লীয়ার করা চাই। তাই এত কথা কহিতে হইতেছে। আরও দুই একটি ক্ষুদ্র কথা এইখানে বলিয়া রাখি, পরে আসল কথার উত্থাপন করিব। মধুরেণ সমাপয়েৎ করিবার পূর্ব্বে চাট্‌নিনা মুখরোচয়েৎ করিলে ক্ষতি কি?

গুপ্ত কবির সমালোচনায় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু।" আমরা বলি, ঈশ্বর গুপ্ত কেবল কেন? মনীষী মাত্রেই মেকির শত্রু। হেমবাবুও মেকির শত্রু। মেকির উপর কশাঘাত করিতে হেমবাবু ছাড়েন নাই। তবে অনেক সময় ভাল করিয়া পারেন নাই, সেজন্য তিনি নিজেই গুপ্ত কবিকে স্মরণ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন,—

"কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত! তুমি এ সময়?
চতুর রসিকরাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্ম-চক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ রঙ্গ বাঙ্গের বাজার॥
কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে!
'লিবার্টির' জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥"

কশাঘাতে গুপ্তের মত সিদ্ধহস্ত না হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। তিনি সমানে গাড়ী চালাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ডাইনে মেকি, বাঁয়ে 'হম্বগ্' উভয়ের পৃষ্ঠেই সমানে চাবুক চালাইয়াছেন। হম্বগ্—গবর্ণর, যে ভোট চালায়; মেকি—ভোটর, যে ভোট দিতে যায়।

একদিকে—"সেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে,
ভুজং দিয়ে ভোটিং খুলে, মিউনিসিপাল বিলে।"
অন্যদিকে—"দয়ালদাদা 'রয়াল' চড়ে যাচ্চে করে যাঁক।
কম্‌বকৃতি, ওকৃত গেল, তকৃত যাবে ফাঁক॥"
তাহারপর ইলবর্ট বিল ; কবি বলিতেছেন :—
"সফেদ কালা মিশ থাবে না, সমান হওয়া পরে,
নাচের পুতুল, হয় কি মানুষ, তুল্লে উঁচু ক'রে ?
হায় কি হলো ? বঙ্গদেশের কপাল গেল ফিরে,
গুলি পুরে গোরা ফৌজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে।
আস্‌ছে সুরেন ঘরে ফিরে এইত কথা শাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি ! ইংরেজ কি—!"

ও কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে ? হুম্বগ্‌-দমন কবিরাই ওরূপ কথা বলিতে পারেন, আমরা পারি না।

"বাপ্‌রে বাপ্‌ কি চেহারা বলন্টিয়ারগণ
দাঁড়িয়ে গেছে সঙ্গীন্‌ হাতে ; কাঁপ্‌চে কলাবন।"
"কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে বলন্টিয়ার ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে।
হুরে হীপ্‌ হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন্‌ স্বাধীন সদা 'ফ্রীডম্‌ এভার।'
নেটিবের কাছে থাড়া ? 'নেভার ! নেভার !'"

তাহারপর, মুখুয্যের 'বাজিমাৎ,' বাঁড়ুয্যের কেয়াবাৎ।
"আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে,
বিদেশ-বাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে।

"বাঙ্গলায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালি কুল-কামিনী হইল স্বাধীন॥"

ঐ পর্য্যন্ত বেশ। কিন্তু তাহার পরে, বাঙ্গালি মেয়ের পীঠে কশাঘাত করা—কবির কলঙ্ক। কৈফিয়ৎ দিয়া কবি এই কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র বলিতেছেন :—

"যে ধিক্কারে লিখিয়াছি, 'বাঙ্গালির মেয়ে',
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।"

কিন্তু ধিক্কার বলিলে কলঙ্ক ক্ষালন হয় না।

"অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যান ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালির মেয়ে।"

এ ত ঘোর মিথ্যা কথা। এমন মিথ্যা, কৈ মিল্, মনক্রীফ্, মেকলেও চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাতে হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাঙ্গালির মেয়ের এ দারুণ চিত্র তিনি কোথায় পাইয়াছেন? আত্মম্ভরিতায় ভর দিয়া, অথচ সহাস্য মুখে, বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদরের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি আমাদের চক্ষুর উপরি নিক্ষেপ করিয়া, হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি আমার মাতা, পত্নী, ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

'বাঙ্গালির মেয়ে'—হেমবাবুর কলঙ্ক; 'দেশলায়ের স্তব'—বিড়ম্বনা; পড়িতে গেলে কেবল ঈশ্বর গুপ্তকে মনে আসে, আর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

রসের তুক্ক—হুতোম প্যাঁচার গান।

১২৯১ সালের আশ্বিনে হেমবাবু 'নবজীবনে' "হুতোম প্যাঁচার গান বা "কলির সহর কলিকাতা" লিখেন। অল্পকাল পরে নবজীবন আফিস হইতে পুস্তিকাকারে ঐ পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের নাম ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। হেমবাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা স্থান পায় নাই। আজি কয় বৎসর হইল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করেন, তখন ঐ পদ্য যে হেমচন্দ্রের তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন। সেই পদ্য সাধারণত রসের ভাষায় কলিকাতার" পৃষ্ঠে কাশাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকির তিরস্কার অপেক্ষা, খাঁটির পুরস্কারই অধিক আছে। হুতোম প্যাঁচার গান হইতে তিনটি পদ্য আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"কার শোভাতে, জলুস্ বেশী আসর জুড়ে যায় ?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসো ত সভায় !
জীবন্ত ভাষার কোষ পাণিনির মই,
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই, নহে টুলো কই।
স্মৃতি দরশনে দৃষ্টি, তর্কের মার্জ্জার,
মোক্ষমূলর ল্যাসেনের টোপর মাথার।
ব্যাকরণে বোপদেব-ভ্রাতর-মামাতো,
সংস্কৃত বিদ্যা-দাঁড়ে হরবোলা কাকাতো !
শিক্কাধারী, খর্ব্বদেহ, দর্শনে দুর্ব্বাসা,
আলাপে তালের শাঁস, কিম্বা শশা খাসা।

"পাতা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়,
এসো এসো বাচস্পতি পাঁও লাগে পায়।
অনেকে ত নৈবিদ্দির ভাগ সরাতে দড়
বলো ত জলুস্ কার সভার মাঝে বড় ?

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর,
গাল জোড়া ফ্যাঁসাগোপ বুড়ো প্যাগম্বর !
চুঁচুড়ার কিনারায় যাঁর পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি, আকারে পাঠান,
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরেজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে,
স্বতেজে উঠিছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল, ধীরে ধীরে পড়ে,
দেশের দোছোট বটো যোদ্ধা কথা গড়ে।
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল !
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ,
দেখো হে পুতুল রাজা—বাঙ্গালীর বাঘ।

তুমিও আসরে এসে বসো একবার,
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার !!

কণ্ঠে তুলসীর মালা, দীন হীন বেশ,
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ,
"সহরের দীন দুঃখী দরিদ্র অনাথ,
আনন্দে দু হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ ;
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে,
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীরবাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এঁদের পাশে, ছাড়্ বিধাতার ;
কি হবে কোমরপেটী ? কে চায় চাপরাশ ?
অনাথ-তারক নামে পেয়েছে যে 'পাশ'।
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার !
আসর বর্ণনা আজ ষ্টপ্ আমার ॥
বড় বড় বুড়ো বুড়ো চুনে নিনু কটা,
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেঁধে ফ্যাটা।
গাইব আবার তখন শুনো গুনটি যেমন যার,
আল্লা গৌর বল এখন, বেলা দুপর পার।
শ্রীপাঠ কল্‌কাতা-তত্ত্বে অধ্যায় প্রথম,
হুতোম প্যাঁচার গান নরম গরম।"

কবি আর ফ্যাটা মাথায় বাঁধিয়া আসরে নামেন নাই। নরম গরম গানও আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এখন নরমও নাই, গরমও নাই—বাঁধা সাড়ে আটানব্বই। রবিবাবুকে গরম লিখিতে নাই—তাঁহার ধর্ম্মে আট্‌কায়। নবীনবাবুকে লিখিতে নাই—তাঁহার কর্ম্মে আট্‌কায়। অতএব—অতএব আমরা এই কবিত্ব-শক্তি-শূন্য নর-বানর—নরম গরম

কথাগুলা কেবল মরমে পুষিয়া, ভরমে ভরমে একরূপে জীবন কাটাইতেছি।

রসের তুক্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ভ্রমরের সেই শ্যাম-সুন্দরের মত বর্ণ, ঝিল্ মিল্ করিতেছে সেই নীলপাখা, সেই গুণ্ গুণ্ রবে মধুর গুঞ্জন, আর প্রয়োজন মত সেই কুটুস্ করিয়া হুল ফুটান—তাহার কিছুই নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় রুচি-জীবী, শুচি-বায়ুগ্রস্ত। যদু ঠাকুরদা বলিতেন,—অন্নে শ্লেষ্মা করে, রুটিতে বায়ু করে, লুচি গুরুপাক; শিক্ষিত বলেন,—গুপ্ত অশ্লীল, দাশরথী অসভ্য, বটতলা vulgar। সুতরাং রসের তুক্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; হেমচন্দ্রে কিছু ছিল, এখন আর কিছুই নাই।

এই তুক্ক-রচনায় হেমবাবু গুপ্ত কবির ক্ষমতা পান নাই; কিন্তু সেজন্য গুপ্ত কবিকে বঙ্গের শেষ কবি বলি নাই। গুপ্ত কবির সব্টাই দেশী। সব্টাই—বাঙ্গালির নিজস্ব। হেমবাবুতে নিজস্ব-পরস্ব,—শিক্ষিতের চরিত্রের মত, শিক্ষিতের হৃদয়ের মত—তাল পাকাইয়া আছে। থাকিলেও হেমচন্দ্রের নিজস্বের অংশ বড় কম নহে। সেইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে, এক তুক-রচনা ছাড়া আর সকল বিষয়েই তিনি গুপ্ত হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, প্রত্যুত প্রকৃষ্টই বটেন।

অনুকরণ বা অনুবাদ।

হেমবাবু-কৃত অনুকরণ বা অনুবাদের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সকলেই জানেন, "রোমিও-জুলিয়েত" ও "নলিনী-বসন্ত"—শেক্‌সপীয়র। "ছায়াময়ী" দান্তে হইলেও ইহার প্রস্তাবনা—ভাষায় ও ছন্দে—বাঙ্গালায় অতুল্য। "লজ্জাবতী" বড়ই মধুর। তবে পদ্মিনীর তুলনায় রঙ্গলাল এক ছত্রে যে লজ্জাবতী চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার কাছে হেমচন্দ্রের সমগ্র কবিতা দাঁড়ায় না।

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পর পরশনে।"

দেশী-বিলাতীর এতই প্রভেদ।

"জীবন সঙ্গীত"। লংফেলোর 'সাম অব্ লাইফ্'; তবে লংফেলোর বিশ্বাসের বল হেমচন্দ্রে ছিল না, তাঁহার কবিতাতেও নাই। "Heart within and God o'er head" এই অমৃত-মাদক—বাঙ্গালা কবিতায় ফুটে নাই ঃ—

"সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান।"

ইংরাজির তুলনায়—ডালকুত্তার কাছে কেলো-ভুলোর মত—নিতান্ত নিস্তেজ।

"ইন্দ্রের সুধাপান।" ড্রাইডেন আসল ; সুধাপান বটে, কিন্তু বিলাতী ব্র্যাণ্ডির মাদকতা সুধায় বুঝি বা নাই। "মদন পারিজাত," পোপ হইতে। ইন্দ্রিয়-লালসার অনুজ্জ্বল চিত্র। গাঁজার ভেল্‌সা—না নেশায় লাগে, না আয়েসে আসে। "চাতক পক্ষী।" শেলির অনুকরণ ; মন্দ

নয়। "প্রজাপতি"—পদ্যপাঠের মত। "জন্মভূমি"—স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই কথার অনুবাদ আছে, আবেগ নাই। তবে প্রার্থনাটি বড় সুন্দর—হেমচন্দ্রের উপযোগী বটে ;—

"হে জগৎপতি, এ দাস মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,—
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক, যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।"

ইহা একরূপ গদ্য হইলেও হৃদয়ের প্রার্থনা বটে।

"নববর্ষ।" টেনিসনের অনুকরণ; অনুকরণ বলিয়া বড় ফাঁকা হইয়াছে। 'ঐ বাজে হোরা' পদ্যের ধুয়া। কিন্তু কোন বাঙ্গালিই উহা বুঝিতে পারে না। শিক্ষিতেরও কাণে বাজে না, হৃদয়ে লাগে না।

এই সকল পরস্ব-গন্ধী কবিতা ছাড়া হেমবাবুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজস্ব আছে। সে সকলের কথা আর বলিব না। কেবল দুইটিমাত্র কবিতার কথা বলিতেছি। "পায়োনিয়রে" সর্ জন ষ্ট্রার্চি কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে "দীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" ১২৯১ সালের পৌষে 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। ইহার এক বৎসর পরে, কলিকাতায় চতুর্থ "কংগ্রেস্" উপলক্ষ করিয়া "রাখী-বন্ধন" প্রকাশিত হইল ; তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গীতি, ভারতের ঐক্যতান রূপে হেমচন্দ্র ঘোষিত করিলেন।

প্রসাদ গুণ।

আরও দুই একটি স্থূল কথা বলিয়া হেমবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলিব।

প্রসাদ গুণে, ভারতের পর কেহ ভারতের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। হেমবাবুও পারেন নাই। প্রসাদ গুণ থাকিলে, আদি, করুণ, শান্তি, এই রসগুলি বেশ ফুটিয়া উঠে। ভারতে সুন্দর ফুটিয়াছে।

বাঙ্গালা ছন্দের জান—ত্রিপদী ও পয়ার। কৃত্তিবাস পয়ারের ওস্তাদ। তাঁহার রামায়ণে তিনি প্রায় আগা-গোড়া সমানে পয়ার চালাইয়াছেন, কিন্তু কৈ অরুচি ত হয় না। নাচাড়ীতে মালঝাঁপের ত্রিপদী আমরা মুকুন্দ-রামেই প্রথম দেখি। তিনি তাহাতে সিদ্ধহস্ত। 'তুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে',—এই সকল নাচাড়ী হইলেও, লঘুত্রিপদী বটে। লঘুত্রিপদীতে ঐরূপ বর্ণনা বেশ হয়। কিন্তু করুণ রসে দীর্ঘত্রিপদীই ভাল। যত লম্বা করিয়া লওয়া যায়, ততই ভাল। ভারতের 'বিদ্যার কাতরতার' কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খুল্লনার খেদ ওরূপ বিলম্বিত না হইলেও আবেগ-পূর্ণ ও প্রসাদ গুণে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী। কাশীরাম পয়ারকেই আবার ত্রিপদীর মত করিয়াছেন। সে বড় সুন্দর,—

> "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
> পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥"

হেমবাবুও, পয়ার ও ত্রিপদী যে বাঙ্গালা পদ্যের জান, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ছন্দে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাহারও অপেক্ষা ঊন নহেন। তবে প্রসাদ গুণ সকলের অপেক্ষা কম থাকাতে, ভাষা ধরিতে ছন্দ হারাইয়া ফেলি, সুর বুঝিতে তাল ভুলিয়া যাই। সুরে তালে

মাথামাথি না থাকিলে, আচ্ছন্ন করে না। কবিতা সঙ্গীতাভাস। সঙ্গীত যেমন সুরে, তালে, লয়ে, একটা কুহক সৃষ্টি করে, করিয়া এই সংসার ভুলাইয়া দেয়, আর এক সংসারে আমাদিগকে লইয়া যায়, কবিতাও তাহাই করে। কবিতার ভাব হইবে—উজ্জ্বল, পরিস্ফুট; ভাষা হইবে—প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট; ছন্দ হইবে—মোলায়েম। এই তিন মেশামিশি করিয়া হৃদয়ের সহিত একটি লয় উৎপাদন করিবে। তবে ত কবিতা সফল হইবে। হেমবাবুর কবিতা অনেকস্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যে যে স্থলে, তিনি প্রসাদ গুণ রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার দশমহাবিদ্যার সূচনায় 'রে সতি, রে সতির' করুণ-শান্ত এবং ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশান-বর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।—

"সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি!
হী হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী-বন।
ফুট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।"

হেমচন্দ্র ও মধুসূদন।

শিক্ষিত বাঙ্গালির প্রধান কবি পাঁচ জন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র। শেষের তিন জন, বাঙ্গালির সৌভাগ্য থাকিলে, আরও কত দিন কত নব নব-রসে আমাদিগকে অভিষিক্ত করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কত হাসিব, কাঁদিব; কত শত বিচিত্র সংসারের লীলাখেলা, তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইবেন— সুতরাং তাঁহাদের কবিত্বের সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। না আসাই প্রার্থনীয়। হেমচন্দ্রের সহিত, তাঁহাদের কাহারও এখন তুলনাই হইতে পারে না। তবে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে। হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, তুলনা করাও বোধ করি কর্ত্তব্য।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ', বি, এর পাঠ্য বলিয়া স্থির হইল। তৎপূর্ব্বেই হেমচন্দ্র সটীক মেঘনাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ভূমিকায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালিকে নব প্রবর্ত্তিত 'মিতাক্ষর' বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,—বড় আগ্রহে, বড় উৎসাহে, বড় অনুরাগে, বড় ব্যাকুলতা সহকারে। তখন হেমচন্দ্র 'চিন্তাতরঙ্গিণী'-প্রণেতা হাইকোর্টের একজন নাম লেখান উকীল মাত্র। কিন্তু 'মধু'ময় মিতাক্ষর বুঝাইবার সেই আগ্রহ, দুর্ব্বোধ মধু-কূট বুঝাইবার জন্য টীকায় সেই যত্ন—উকীলের ওকালতি বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হইল, হেমচন্দ্র মধুসূদনের গোড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য।

অনেক দিন পরে, মধুসূদনের 'স্বর্গারোহণে' হেমচন্দ্র যে দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহাতেও সেই ভাব প্রকটিত হয়ঃ—

"হবে কি সে দিন, এ গৌড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা ?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা।"

কিন্তু হেমচন্দ্র, মধুসূদনের এরূপ ভক্ত, এরূপ গোঁড়া, এরূপ শিষ্যানুকল্প হইয়াও, 'মিতাক্ষর' গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই, তিনি জানেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, এখন আমি বলিতে পারিব না। তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি 'মিতাক্ষর' কেবল নিগড়-বন্ধন-মোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য সাধন নহে। চুড়, বলয়, অনন্ত এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চুড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে ? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল ? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দ ত নিগড়। নিগড় সৌরজগতে ; নিগড় কাব্য-জগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে কারণেই হউক হেমচন্দ্র মধুসূদনের মিতাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তবে মধুসূদনের কবিত্ব তিনি বিশেষ আয়ত্ব করিয়াছিলেন। কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন কখন পারি না। কবি গেটে শকুন্তলার সৌন্দর্য্য দশপংক্তিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু আর একজন কবি রবীন্দ্রনাথ, সেই কয় পংক্তি বুঝাইয়া দিলে, তবে আমরা সেই সমালোচনা সম্যক্ বুঝিতে পারি। বিক্টর হুগো বুঝাইলে, তবে শেক্সপীয়র বুঝা গেল। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইলে,

তবে কুমার-শকুন্তলা বুঝিতে পারিলাম। হেমচন্দ্র মধুসূদনের বীর-কাব্য মেঘনাদ বুঝিয়াছিলেন; আমাদিগকে বুঝাইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারই কবিত্ব-গুণে আমরা বুঝিতেছিলাম জাতিবৈর। সেই জাতিবৈরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, বীরকাব্যের অভিনব প্রতিমা হেমচন্দ্র বঙ্গে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—বৃত্রসংহার। এই কাব্যের সূক্ষ্ম শিক্ষার কথা পরে বিস্তৃত ভাবে বলিব, এখন মধুসূদনে হেমচন্দ্রে আমরা তুলনা করিতেছি মাত্র। বীরকাব্যে হেমচন্দ্র—সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; সমকালবর্ত্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে।

বৃত্র-সংহারের শচী-চপলার কথোপকথন,—

"কেমনে ভুলিব বল্ মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে!
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে!
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়ন ভ্রান্তি,
কতদিন সখি রে না হেরি!
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি!
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,

"উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণ-শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত !
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ প্রদায়িনী,
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নয়নতলে, উছলি মধুর জলে
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর !
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা !
আমার সে নন্দন-বিপিন !
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাত কে করে মলিন !"—

ইত্যাদি বর্ণনার সহিত মেঘনাদের সীতা-সরমার কথাবার্ত্তা তুলনা করুন ;—

"পঞ্চবটী বনে গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !

"অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙ্গে)!
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বলিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,

"নানা কথা! এখনও, বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"

রুদ্রপীড়-পতনের পর, হঠাৎ ইন্দুবালার অনুমরণ-সংবাদে বৃত্রাসুরের মুখে,—

"শুকায়েছে হায়,
সে চারু কোমল লতা ইন্দুবালা মম!
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদ্ভুত
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এক কালে! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম
এত দিনে অসুর-কুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিম কালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শক্রর কোলে! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?"—

ইত্যাদি করুণ কাহিনীর সহিত প্রমীলার সহমরণ-স্থলে, শ্মশান-শায়িত পুত্রের শব লক্ষ্য করিয়া রাবণের সে বীর কাতরোক্তি,—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—

"সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাচ্ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী.—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"—

তুলনা করুণ; নিশ্চয়ই দেখিবেন, ওস্তাদ মাইকেল, ওস্তাদি বজায় রাখিয়াছেন।

তাহার পর দেব-চরিত্র-চিত্রন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মধুসূদন রাক্ষস-পক্ষের

শৌর্য্য-বীর্য্য মহিমাময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরী-চিত্র হেমচন্দ্রের ঐ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেবতার মত।

বৃত্রসংহারে ছন্দ-বৈচিত্র থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না। বঙ্কিমবাবু মাথার দিব্য দিয়া বৃত্রসংহারের যুদ্ধ-বর্ণনার প্রশংসা করিলেও, কাশীদাসের এবং মাইকেলের এই ভাগে আমাকে যত মোহিত করে তত বৃত্রসংহারে করে না।

বাঙ্গালির 'জাতীয় জীবন' ও হেমচন্দ্র।

এখন শেষ কথা অথচ আসল কথা কহিতে হইতেছে। 'হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা' সমিতি বলিয়াছেন—হেমচন্দ্র "বাঙ্গালীর অবসন্ন জাতীয় জীবনে উৎসাহের সঞ্চার" করিয়াছেন। কথাটি সমীচীন বটে, তবে, কি ভাবে, কেমন করিয়া, কাব্যের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া হেমচন্দ্র আমাদের "জাতীয় জীবনে" উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া আমাদের বুঝা কর্ত্তব্য।

প্রথমত, "বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে"—এই কথাটাই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 'ভারতীয় জাতীয় জীবন' কংগ্রেস-কর্ত্তারা বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা কিছুই বুঝি না। সেই ভারতীয় জাতীয় জীবনের অংশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন হয়, তাহা হইলে সে ত আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তা না বলিয়া, যদি হিন্দু-জীবনের অংশ বলিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি—তাহাতেও বিশেষ স্থবিধা হয় না। কতটুকু অংশ? যতটুকু বাঙ্গালার ভূগোলের মধ্যে? বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে? তবে কাশী কি আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু নয়? রাম-লক্ষ্মণ? তাঁরাও কি কিছু নন? সে আবার কিরূপ জাতীয় জীবন হইল? তা'ত বুঝিলাম না।

আসল কথা—'জাতীয়তা', 'জাতীয় জীবন', 'দেশহিতৈষিতা,' প্রভৃতি বাক্যগুলি একটু বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে,—নতুবা 'কার্য্যঞ্চাগের' মত সকলেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিবে, কেহ কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিবে না,—সেটা কিছু নয়। মরা কথার ওরূপ ব্যবহার চলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না;

কিন্তু জাতীয়তা বলিয়া যদি কিছু জীবন্ত জিনিষ করিতে, রাখিতে বা বুঝিতে চাও, তাহা হইলে, 'কার্য্যঞ্চাগের' মত করিলে চলিবে কেন? আর একটি কথা—দেশহিতৈষিতা। সে কিরূপ পদার্থ? দেশহিতৈষিতা কি বলে যে, কাশী-পুরী-শ্রীধাম হইতে মাল্‌দা-মুর্শিদাবাদ ভাল? তা'ত আমরা বুঝিব না। তবেই হইল, আমরা হইলাম বর্ণাশ্রমবাদী, অধিকার-ভেদবাদী হিন্দু। কাজেই ঐ কথাগুলি আমাদের জন্য নহে। আমরা ব্যবহার করি—তোতাপাখীর মত। সে ব্যবহারে কোন কাজ হয় না।

আমাদের কথা—কার্য্য হয় ধর্ম্মে। সৎকার্য্য হয় ধর্ম্মমূলে। কিন্তু ইহকালেই ধর্ম্মের শেষ নহে। ধর্ম্ম ইহকাল, পরকাল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সেই ধর্ম্ম-রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য। আমাদের আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। তাহাতে 'জাতীয়তা' আসে আসুক; পেট্রিয়টিস্‌ম্ পড়ে পড়ুক। বাস্তবিক সকলই উহাতে আসে। মনুষ্যত্বের সকল উপাদানই ধর্ম্মে। স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের স্থিতি ও পুষ্টি হয়।

বহুকাল হইতে চীনামান চীন অর্থাৎ স্বদেশ রক্ষা করিতেছে। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে নাই; জাতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ধর্ম্মে, চীন কখন কন্‌ফুসীয়, কখন তান্ত্রিক, কখন বৌদ্ধ অথচ কৃমি-কীট-"ঞ্‌পি" ভোজী। জাতিতে চীন হুন-তুরস্ক-মোগল মিশ্র। কিন্তু দেশ—খাস্ চীন; এলাকা—মহাচীন। এ একরূপ দেশহিতৈষিতা।

ধর্ম্ম আছে, জাতি আছে, পুরাণ আছে, শাস্ত্র আছে, দেশ নাই—য়ুদীর। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই দেশান্তরী হইয়াও য়ুদী, জ্ঞানে জ্ঞানবান্, ধনে ধনবান্, দীর্ঘায়ু, সচ্ছন্দ, সবল, সুন্দর। য়ুদী, পালেস্তীনের ব্যাঙ্ক হইতে সম্রাটদিগকে ঋণ দান করে। য়ুদী সঙ্গীত-পটু, ভাস্কর্য্য-নিপুণ, চিত্র-বিশারদ।

পার্শীরও দেশ নাই,—পোষাক, পরিচ্ছদ, আচার নাই। যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম রাখিয়াছে ও সম্পূর্ণ জাতি রাখিয়াছে বলিয়া দেশান্তরী হইয়াও পার্শী জীজীভাই, রায়চাঁদ, নওরোজি, টাটার জন্ম দিতেছে। য়ূদী ও পার্শী হিন্দুর মত বটে,তবে দেশান্তরিত।

মুসলমানের জাতি নাই। কত জাতি মুসলমানের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মুর, কাফ্রী, মিসরী, হাফ্সী, আরবী, পার্শী, তুর্কি, তাতার, হিন্দু, হিস্পানি, গান্ধারী, মালয়ী—এই সকল মিলিয়া মুসলমান। মুসলমানের জাতি নাই, রক্তের মিল নাই। কিন্তু ইস্লামের ধর্ম্মবন্ধন আছে। সেই বন্ধনের বলে মুসলমান এখনও জগতে রুমের রাজা। নতুবা য়ুরোপের জাতিবিদ্বেষে এতদিন কোন্ কালে রুমের সহিত রুমের রাজা ভাসিয়া যাইতেন; সেন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা হইত।

জাপানের অভ্যুত্থান বিজাতি-বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয়ের অনুকরণে। জাপানীর জাতির ঠিক নাই, ধর্ম্মের ঠিক নাই, ইতিহাস নাই—কিছুই নাই। আছে একদিকে অনুকরণ, অন্য দিকে বিদ্বেষ। অনেকটা আমরা বুঝিতে পারি, তাই চারিদিকে এরূপ জাপান জাপান শব্দ হইতেছে।

ব্যবহার ব্যবস্থায় রুষের সাম্রাজ্য। রুষ বিজিত জাতির ধর্ম্মে-কর্ম্মে হস্তার্পণ করে না, কেবল রাজস্ব-বন্দোবস্তের গুটিকত মূল কথা চালায়, আর দুর্গ ও বলের ব্যবস্থা করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করে।

'আর ইংরাজ'? ইংরাজের ভাষার দোহাই দিয়া ইংরাজের পসার-প্রতিপত্তি জাঁকজমক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যত লোক ইংরাজিতে কথা বলিত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার শতগুণ অধিক লোক ইংরাজি বলিয়াছে, আর এই শতাব্দীতে কত গুণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরাজি বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা ও যুক্তপ্রদেশে ইংরাজিই সম্বল। ভারত-সাম্রাজ্য, তাহার দক্ষিণে বামে বর্ম্মা-বেলুচ ইংরাজি অল্পে অল্পে গ্রাস করিতেছে। আর আপনার দেশ ত আছেই। একভাষীর মধ্যে একতা হইবে, এক শাসন হইবে, ইহাই প্রকৃত Imperialism। একভাষীর মধ্যে যে সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যই—সাম্রাজ্য। সিসিলরোড্‌স্ এই সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে কোটি কোটি টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

চীনের গৌরব—দেশ; য়ূদীর গৌরব—জাতি; মুসলমানের গৌরব—জাতিহীন ধর্ম্ম। ইংরাজের গৌরব—ভাষা। আর আমাদের? আমরা কি লইয়া থাকিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের স্বধর্ম্ম রক্ষা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। শিবজী যে মারাট্টার মধ্যে জীবনী যোগ করিয়াছিলেন, সে গুরু-ভক্তি-বলে, রামদাস স্বামীর মন্ত্রণা-যোগে। রাণাপ্রতাপ যে আকবরের বিক্রম এবং কৌশল ব্যর্থ করিয়াছিলেন, সে কেবল স্বধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত। অম্বের-যোধপুর ধর্ম্মচ্যুত হইতে বসিয়াছে, তাই দেখিয়াই না মহা রাণার রণসজ্জা।

স্বধর্ম্ম-রক্ষা ব্যতীত হিন্দুর স্থিতি-উন্নতির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তবে এই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের সকল দিক রক্ষাই করিতে হইবে। ভারত কর্ম্মক্ষেত্র; অন্যান্য ভোগভূমি। ভোগে আমাদের ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম কর্ম্মে। ভোগ আপনা আপনি হয়। কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষত্রে আমাদের থাকা আবশ্যক। আবার ভারত পুণ্য-ভূমি—তীর্থ-ক্ষেত্র। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী, কাশী-কাঞ্চী-শ্রীপুরী-শ্রীধাম—এ সকল তীর্থ হিন্দু ভুলিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না। সুতরাং ভারত আমাদের ভরসা, ভারত আমরা ভালবাসি। আমরা পেট্রিয়ট্। আমরা চীন বা স্কচ। অন্য দিকে, আমরা য়ূদী অপেক্ষাও জাতীয়ত্বের

গৌরব করি। জানি ও মানি যে, জাতি-সঙ্করে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য জাতি-রক্ষা আবশ্যক

আমরা মন্ত্র মানি। অর্থাৎ দেবভাষার গৌরব করি। তুমি ম্যাপ দেখাইয়া বল, 'ঐ দেখ ইংরাজি কত দূর বিস্তৃত ;' আমি ইতিহাস খুলিয়া দেখাইয়া দিই—বলি, 'ঐ দেখ বৈদিকী সংস্কৃতা ভাষা কত দূর হইতে প্রবাহিত হইতেছে।' তোমার দেশে বিস্তৃতি, আমার কালে বিস্তৃতি। আমার দেব-ভাষার গৌরব তুমিও ত করিতেছ।

দেশ, জাতি, ভাষা, আচার, ব্যবহার সকলই সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে হইলে, সকলই রক্ষা করা আবশ্যক। যে স্বধর্ম্ম-প্রতিপালক সেই আমাদের দেশের প্রকৃত পেট্রিয়ট্; স্বদেশ, স্বজাতি, সনাতন আচার-ব্যবহার—সকলেরই অনুরাগী। কেবল দেশ-ভক্ত হওয়ার অর্থ নাই।

এই স্বধর্ম্মানুরাগ দেশে যখন প্রবল ছিল, তখন স্বদেশ-ভক্তি, স্বজাতি-বৎসলতা বলিয়া, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন বোধ করি হইয়াছে ;—কেন না—

"সীতা-হারা হয়ে রামের, বাঁদরে আদর।"

আর এই বানরের সাহায্যেই হয়ত আবার সীতার উদ্ধার হইবে। দেশ-ভক্তির, জাতি-ভক্তির দোহাই দিতে দিতে হয়ত, আমরা ক্রমে স্বধর্ম্মানুরাগী হইব।

এই বানর আনিয়াছেন, বা ঝোপে ঝাপে ছিল—তাহাদের বাহির করিয়াছেন, লাফাইতে দিয়াছেন—হেমবাবু। ইহাকেই বলে, 'অবসন্ন জাতীয় জীবনে উৎসাহের সঞ্চার।' এই বানর কাজে লাগাইতে পার, সীতার উদ্ধার হইবে, নতুবা বানরের লাফালাফিই সার।

হেমচন্দ্রের কাব্যের কৃতিত্ব স্বধর্ম্মানুরাগ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। তিনি

শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি ; শিক্ষিত বাঙ্গালির সাধারণত ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। হেমবাবুর কাব্যেও সাধারণত নাই। তিনি কোথাও স্মরণ-শক্তি-গুণে—স্বদেশানুরাগী, কোথাও জাতি-বৈর-বশে—স্বজাতি-বৎসল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে,
মধু-মাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদ-গান,
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ ;
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে,
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র অর্ণব আকাশ মণ্ডল
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।"

এইগুলি জাতি-বৎসলতা। আবার,—

"অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,

"ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনও ধাবিত
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল।"

এইগুলি দেশ-বৎসলতা। কিন্তু সর্ব্বত্রই জাতি-বৈর আছে। সেই কথাটা আরও বিস্তারিত বলিতেছি।

জাতি-বৈর।

বঙ্কিমবাবুর কথায় জাতি-বৈর কি তাহা বলিব।

"সাধারণ বাঙ্গালির অপেক্ষা সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাদের নিকট, বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা। * * * অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী ও ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতি-বৈর দূর হইতে পারে। * * * * আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি। অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল।

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও, পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতি-বৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের জন্যই আমরা

ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক। উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"*

এই যে জাতি-বৈর ঘটিয়াছে, ইহার প্রধান ঘটক—হেমবাবু। হেমবাবুই কখন ডুক্‌রে, কখন ফুক্‌রে, ক্রমাগত বলিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের চক্ষে যতই কেন নিকৃষ্ট হই না, আমরা আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ভুলি নাই, ভুলিতে পারিব না।

"দেখ্, চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে,
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে,
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী—ধরা রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী,
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।

তোমারো ত বুকে কত শত বার—
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,

* সাধারণী—১১ই কার্ত্তিক, ১২৮০।

"কালেতে না জানি কি হবে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান।
ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজি—উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—"আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" সেই "সৌভাগ্যের" সূত্রপাত হেমবাবুর কবিত্ব হইতে। জাতি-বৈর ছিল। জাতি-বৈর একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ ছিল না; কাজেই জাতি-বৈরের জাঁক ছিল না। জাতি-বৈর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছিল,—টোলের ভাঙ্গাঘরে; ইংরাজ-নবীশের হইয়াছিল,—রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়া, হিন্দু-পেট্রিয়টের পঠন সময়ে, আর রঙ্গলালের পদ্যে। কিন্তু জাতি বৈর তখন জাঁকাইয়া উঠে নাই, ছড়াইয়া পড়ে নাই।

কার্ত্তিকের কোজাগরে লক্ষ্মীর, সংক্রান্তিতে ষড়াননের, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর, ভাদ্র-সংক্রান্তিতে গণেশের পূজা হইত; কিন্তু দশভুজা দেবী-পার্শ্বে কার্ত্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী খাড়া করিয়া মহাষ্টমীতে মহাদেবীর মহাপূজার আরম্ভ হয় নাই। মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা মহাকবি হেমচন্দ্রই করেন। বোধনের সেই ঘণ্টাধ্বনি, কোটি-কণ্ঠ-নিসৃত 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' রবের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, চারি দিকের সেই কোলাহল, বালক-কণ্ঠের সেই হলহলা—সকলই মনে পড়িতেছে।—হাকীম, কেরাণী, মুহুরী, আমলা,—উকীল, মোক্তার, আহেলে-মামলা,—মাষ্টার, পণ্ডিত, ছাত্র,—নায়েব, পেস্কার, গোমস্তা—সকলেই একপ্রাণে তান ধরিয়াছেন, আর—

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়া বিজলী,
দেখিতে লাগিল জনেক যুবা ;

তার—

"আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে, গায়ে নামাবলি,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়া বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।"

সেই মোগল-প্রাদুর্ভাব সময়ের, মারহাট্টা-হৃদয়ের জাতি-বৈর নির্জীব বাঙ্গালির স্কুল-কলেজে, কোর্টে আদালতে, জমীদারের কাছারী ঘরে, সভাতার অন্তঃপুরে—ছড়াইয়া পড়িল। হেমবাবুর প্রতিভা আমাদের সৌভাগ্যের পরিচয়-স্বরূপ হইল।

কিন্তু ঐ কাছারী-কলেজে পর্য্যন্ত। হাঠে মাঠে, ঘাটে বাটে একথা পৌঁছে নাই। হাটে হাটুয়া জানে না, হেমবাবু কে? মাঠে চাষা হেমবাবুর নাম-গন্ধ শুনে নাই। স্নানঘাটের পল্লীযুবতী বুঝে না যে 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'। বাটে লম্বালাঠীতে-গামছা-বাঁধা কত লোক চলিয়াছে—জানে না ভারত কাহাকে বলে। দাশরথীর প্রসার হেমবাবু পান নাই। তবে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি হইয়াও, অনেক অর্দ্ধ শিক্ষিত, 'অশিক্ষিত' অপ্রাপ্ত-বয়স্ককে এই একরূপ বিচিত্রা শিক্ষায় শিক্ষিতের স্পর্দ্ধান্বিত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভারত-সঙ্গীতে কাছারী-কলেজে একরূপ 'জাতীয় জীবন' সংগঠিত, উৎসারিত, দৃপ্ত, প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এই যে দৃপ্তি, এই যে

উৎসাহ—সমস্তই বানরের। তবে বানরের দ্বারা সীতা-উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, সীতাহারা হইয়া শ্রীরামের বাঁদরে আদর।

"আমরা ছিলাম ভাল, তোমরা কেন আমাদের পদ-দলন কর?" এই দুইটি কথা লইয়া কোন জাতিরই জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। ভারতবাসীর ত জাতীয় জীবনই নাই।

বৃত্রসংহারের উপদেশ ও হেমচন্দ্রের ধর্ম্ম-বিশ্বাস।

ভারতবাসী ধর্ম্মজীবন। ধর্ম্মশূন্য, বিশ্বাসশূন্য কাতরতার ধ্বনিতে বা আস্ফালনের গর্জ্জনে, ভারতবাসীর নবজীবন লাভের সম্ভাবনা নাই। ভারতবাসীর স্থিতি এবং গতি—ধর্ম্মে—ধর্ম্মে—ধর্ম্মে।

ঐ কথা হেমবাবু বুঝিয়াও যে আমাদিগকে বুঝাইবার মত বুঝান নাই, ইহাই আমাদিগের দুর্ভাগ্য।

ভারত-জাগান অর্থাৎ ভারতের বানর-জাগান উৎসাহ-ভরে কবি বলিয়াছেন,—

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্য-সিদ্ধি হ'ত, এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না, খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।"

অর্থাৎ তপস্যা, ভক্তি, দেব-আরাধনা এ সকলই অকিঞ্চিৎকর।

এমন ধর্ম্মশূন্য, বিশ্বাসশূন্য, ভক্তিশূন্য, সাধনাশূন্য প্রকরণের উপদেশ, এরূপ দম্ভভরে ভারতবাসীকে পূর্ব্বে কেহ কখন দেয় নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালির ইহাই চরম শিক্ষা। এবং ইহাই আমাদের দুঃখের কথা। কিন্তু হেমবাবুর কবিত্বের বিকাশে উহার উত্তর-গীতিও আছে। তাহাই আমার সুখের কথা।

তাই হেমবাবুর কথায় হেমবাবুকে বলি—

"তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ, চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে।"

বৃত্রসংহারের উপদেশ ঐ উপদেশের বিপরীত। বৃত্রসংহার কবির পরিপক্ক বয়সের ফল। সে কথা বলিব।

সমরে অমরের পরাজয় হইয়াছে। অমরবৃন্দ পাতালপুরে। অমরায় দৈত্যরাজ দলে বলে অধিষ্ঠিত। তখন 'বৃত্রসংহার' কাব্যের আরম্ভ। আমরা তখন জানি না, দেবরাজ ইন্দ্র কোথায়? দেব-সেনাপতি স্কন্দ, অনলমূর্ত্তি বৈশ্বানর অচিরে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, অস্ত্রের প্রশংসা শত মুখে করিতেছেন। তখন গভীর, ধীর, প্রশান্ত-মূর্ত্তি প্রচেতা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিতেছেন,—

"দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল? অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপন?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,

"কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যান-নিরত?"

ধীর, গভীর, প্রশান্ত প্রচেতার পদানুসরণ করিয়া আমরাও ত বলিতে পারি, যদি এখনকার দিনে তপস্যার ফল না থাকে, যদি তরবারিই পরমপুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে, এখনকার দিনের উন্নত কাব্যে কাব্য-নায়কের তপস্যা কেন? ধ্যান কেন? আর তাই কি সভ্যতার অনুমোদিত ইলেকট্রিক পাখার নীচে ইমন্ রাগের সঙ্গে অল্প স্বল্প ধ্যান গা? ইন্দ্র নিজেই সে তপস্যার পরিচয় দিতেছেন ঃ—

"পূর্ব্বে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গ-বিমণ্ডিত,
লতা-গুল্ম-সমাকীর্ণ শ্যামল, সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!
গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি-বিরহিত তাপ-দগ্ধ সদা
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকা-রাশিতে!
নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত-মাঝে হয়েছে প্রকাশ
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান-বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূরে অন্তরীক্ষ পথে।"

এইরূপ যুগযুগান্ত তপস্যা করিয়া—

"কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা-সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইলা জাগ্রত,

"নিয়তি প্রসন্ন তারে, হৈলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র বিনাশ-উপায় ॥"

তবে কে বলিল, তপস্যার ফল নাই? কে বলে, সাধনায় সিদ্ধি হয় না? কে বলিল, দেবের হউক, মনুষ্যের হউক, তরবারিই সর্ব্বস্ব? পশুবলই পরমার্থ?

নিয়তি বলিলেন,—

"কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি ॥"

আবার সেই আরাধনা—দেবতার নিকটে নিবেদন। জগজ্জননীর করুণাকটাক্ষ, আশুতোষে অনুরোধ ও অনুযোগ। মহাদেবের ক্রোধ, পরক্ষণেই নিবৃত্তি। শেষে ইন্দ্রকে অভয়-দান।—

"পুরন্দর! ভাগ্যে তার, মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচিমুনির সন্নিধানে,
মহা তেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে,
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্র হৃদয়।
বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা করি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"

আবার তপস্যা—বিষ্ণু-আরাধনা! হিন্দু হইয়া এসকল কথা কি এড়ান যায়? যায় না।

সাধনা চাই, আরাধনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই! পরহিত-ব্রতে দধীচির দেহত্যাগে তাহাই উদ্দিষ্ট। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ-সাধন অনুদিন!
পরহিত-ব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে, উদ্যাপিলে আজ।"

দেবরাজ কর্ত্তৃক কল্পান্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পূজার পর, কঠোরতপস্বী বিষ্ণু-সেবক দধীচি ঋষির পরহিতব্রতে ত্যক্ত-দেহের অস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি। সেই বজ্রে বৃত্রের বিনাশ।

বৃত্রসংহার কাব্যের এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরবারি পরমপুরুষার্থ একথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে; তাহাতে যুবক হেমবাবুর পরাজয়ে বর্ষীয়ান্ হেমচন্দ্রের জয়জয়কারই ঘোষিত হইবার কথা। অথচ যুবক হেমচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও, ঐ দুটি কথা লুকান-ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত। জ্বালা জ্বলন্ত, জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ।

ধর্ম্ম পালনে, বিধাতার বিধানে বিশ্বাস হয়; মঙ্গলময়ের সার্ব্বমাঙ্গল্যে প্রতীতি জন্মে; আশায় আশ্বাসে হৃদয়ে বল, মনে সাহস, শরীরে শূরত্ব সঞ্চিত হইতে থাকে। বৃত্রসংহারে এ সকল কথা নাই। আছে কেবল জাতি-বৈরের জ্বালা। এই জাতি-বৈরে আমরা যেরূপ জ্বালাতন, পাতালপুরে প্রচেতা ব্যতীত আমাদের দেবতারাও সেইরূপ জ্বালাতন। দেবগণ ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ, বিমর্ষ, চিন্তিত, আকুল। আপনাআপনি ধিক্কার উঠিল, তোমরা 'অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস' কেন? পরাজিত দেবগণ পতঙ্গবৎ আবার বহ্নিমুখে পতিত হইলেন, আবার পরাজিত হইলেন। আর দেবতার রাজা ইন্দ্র সেই সময়ে তপস্যা-নিরত। কাহার তপস্যা করিতেছেন? গ্রীক্-গড্ নিয়তির।—সেই

"পাষাণ-মূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি সহৃদয়তা, কিম্বা দয়ালেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র। নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।"

যে দেশে ভগবানের মুখে ভজাম্যহং ঘোষিত হইয়াছে,—যে দেশে ভগবান্ ভক্তের ভজনাকারী, সেই দেশে একজন আকাট, আড়ষ্ট, অনড়, অচল, নিস্পন্দ পাষাণ-দেবতার ভজনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, সুতরাং বিড়ম্বিত ইন্দ্র আমাদের আদর্শ নহেন।

বৃত্রসংহারে দেবারাধনা আছে, কিন্তু কিসের জন্য দেবারাধনা করিতে হয়, তাহা বুঝান নাই। সুতরাং ঔষধের ব্যবস্থা আমরা বুঝি না; বুঝি, দেখি, কেবল জ্বালা আর জ্বালা। দেবগণে জ্বালা, শচীতে বিষম জ্বালা, চপলায় জ্বালা, জয়ন্তে জ্বালা। কাম-রতি অমরাবতীতে দৈত্যসেবায় নিযুক্ত—সেই ত এক বিষম জ্বালা। আর ও পক্ষে দেবজয়ী বৃত্রের জ্বালাই কি কম গা? বৃত্র বলিতেছেন :—

"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা!
এখনও স্বরগ-বেষ্টি দেবতা সকল!
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে
মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেথা করি আস্ফালন?
ধিক্! আজি দৈত্যনামে! হে সৈনিকগণ,
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!

"কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম
দনুজ যাহার তেজে চির রণজয়ী ?"

রুদ্রপীড়ের জ্বালা আর একরূপ :—

"জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, বৃথা বংশখ্যাতি,
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা !
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চির স্মরণীয় !"

ঐন্দ্রিলার জ্বালা—প্রাকৃতা রমণীর আকাঙ্ক্ষা। দেবগণ পরাজিত হইয়াছে; অমরাবতী অধিকৃতা, কিন্তু শচী ত সেবিকা হয় নাই, তা'র পর,

"শুনেছি সে নাকি পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে ?"

—সে যে বড় জ্বালা।

আর ইন্দুবালার জ্বালা—জ্বালা নহে, বঙ্গ-বধূর দুঃখ।—

"পল অনুপল মম চিত্তে ভয়,
সতত অন্তরে দহি ;
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি ?"

এই জ্বালাময়ী কবিতায় কাজেই আমরা স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপাদান পাই না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, জ্বালায় ভ্রূক্ষেপ থাকে না, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য হয়। বৃত্রসংহারে তাহা নাই।

বৃত্রসংহার ছাড়া, আরও অনেক গুলি পৌরাণিকী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা হেমবাবুর আছে। কিন্তু কোথাও ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই।

পুণ্যভূমি ভারতের অন্যতর কেন্দ্রস্থল কাশীধামের সহিত হেমচন্দ্র জড়জীবনে সংসৃষ্ট ছিলেন। বহু কাল হইতে সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করিতেন, অনেক দিন বাসও করিয়াছিলেন। কাশীধামে জড়জীবন-যাপনের ফল, হেমবাবুর কতকগুলি কবিতা। 'কাশীদৃশ্য', 'মণিকর্ণিকা', 'বিশ্বেশ্বরের আরতি', 'গঙ্গার মূর্ত্তি', 'গঙ্গা' এগুলি ত বটেই ; আর 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'অন্নদার শিবপূজা' এগুলিও আংশিক।

বহুকাল পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—'শিবের অন্নদাপূজা'—টক্কর দিয়া হেমচন্দ্র গাহিতেছেন 'অন্নদার শিবপূজা'। এই শিবপূজায় সকলের আনন্দ হইয়াছে, হেমবাবু সেই আনন্দ গান করিতেছেন :—

"বিমল তরঙ্গে, আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কল কল নাদে এ শুভ সংবাদে
জগৎ-সংসারে আনন্দ কও।—
জগৎ-জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে ;
পূরিবে বাসনা, আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে।
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশীমাঝে আজি এ শুভবাণী ;
আবার শুন না, 'পূরাও বাসনা'
গাইছে অই যে ভবের রাণী॥"

ভবরাণী বলিতেছেন :—

"পূরাও বাসনা ওহে বিশ্বনাথ!
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,

"তেমতি করিয়া সৃজিলা যেদিন
দেখাও আবার জগৎ পুরে।
তেমতি পবনে ফুটিছে কানন,
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগৎ হাসে।"

অর্থাৎ দশমহাবিদ্যার বিপরীত বার্ত্তা। দশমহাবিদ্যায় বলা হইয়াছে, evolution অর্থাৎ ক্রম-পরিণামে মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি। এখানে মহালক্ষ্মী মহাদেবকে বলিতেছেন, জগতের আদিতেই উল্লাসের হিল্লোল। তবে বুঝি, দেব-দেবীর ক্রম-বিবাদ চিরদিনই আছে। কিন্তু ও কথার জন্য এ কথা তুলি নাই। ভারতচন্দ্রে হেমচন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র কথার তুলনা করিতেছি।

অন্নদার শিবপূজায় জগতের আনন্দবার্ত্তা কিরূপে বিঘোষিত হইল, তাহা শুনিলেন; এখন দেখুন, শিবের অন্নদা-পূজায় ভারত-জগতের কিরূপ আনন্দ।

পূরবী—দ্রুতত্রিতালী।

চল কাশীমাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব।
মণি-কর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
অন্নদা-মঙ্গল ছলে হর-গুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন, নানা রস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব।
শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞান-বাপীকূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে, কোথায় না ধাব।

শিবের করুণা হবে, দেখিব ভবানী-ভবে,
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥

হরগুণ গানে পাপ-তাপ ছন্ন হইয়াছে, (শাওভাব) শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে ; শিবের কৃপায় শিব-শিবা যুগলরূপের সন্দর্শন লাভ হইয়াছে। তাহার পর হরি-ভক্তির যাজ্ঞা। এমন মধুময়ী কথা হেমচন্দ্রে কোথাও নাই। বড় দুঃখেই হেমচন্দ্র আর্ত্তি জানাইয়াছেন :—

"হে দুর্গে দুর্গতি-হরা কাশীশ্বর গৃহিণি !
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্যপরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিবমোহিনি ?
আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা,
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধ-দগ্ধ অন্তরে ?
দু'ধারে বরুণা-অসি
অই কাশী বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।"

ভক্তিশূন্য, বিশ্বাসশূন্য ছন্ন হৃদয়ে হেমচন্দ্রের শান্তিলাভ হয় নাই ! হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও জীবনী হইতে এই বিচিত্রা শিক্ষা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।

কোনরূপ বৈর-ভাব হৃদয়ে পুষিয়া রাখিলে, সে হৃদয়ে আর শান্তি আসে না। সুতরাং জাতিবৈর শান্তির শত্রু। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বজাতি-প্রেম বিশেষ তীব্র থাকিলেও তাহাতে শান্তির ব্যাঘাত হয় না। হেমচন্দ্রে জাতি-প্রেম অপেক্ষা জাতি-বৈর তীব্র, সুতরাং অশান্তিও

তীব্রতর। ঈশ্বর গুপ্তে জাতি-বৈর অল্প স্বল্প ছিল, কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য ছিল প্রচুর। বঙ্কিমবাবু বলেন, সেই স্বদেশ-বাৎসল্য "তীব্র ও বিশুদ্ধ।" সেই জন্য বঙ্কিমবাবু অনুরোধ করিয়াছেন :—

"নিম্ন কয়ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন :—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

"এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।"

এ স্বজাতি-প্রেম, এরূপ দেশ-বাৎসল্য হেমচন্দ্রে নাই। থাকিলে, 'কুলীনার হিন্দু তরাচার' লিখিতে, তাঁহার লেখনী কাঁপিত, বলিতে তাঁহার জিহ্বা জড়াইয়া যাইত। ঐরূপ লেখা যদি স্বজাতি-প্রেম হয়, তবে স্বজাতি-বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা জানি না।

স্বধর্ম্মানুরাগ-জনিত স্বজাতিপ্রেম হেমচন্দ্রে থাকিলে, তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতেন—না বুঝিলেও বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, না পারিলে যাবজ্জীবন আলোচনা করিতেন। কিন্তু তা' কৈ?

বিধর্ম্মী মিসনরির মত হেমচন্দ্র বলিতেছেন :—

"পুরুষ দু'দিন পরে, আবার বিবাহ করে,
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে?

কেঁদেছি অনেক দিন, কাঁদিব না আর,
পূরাইব হৃদয়ের কামনা এ বার।
ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দু-ধর্ম্ম, ছারখার হবে,
হিন্দু-কুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।
দেখ রে ! দুর্ম্মতি যত, চির ম্লেচ্ছ-পদানত
বিধবার শাঁপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।"

অথচ অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্র বলিতেছেন :—

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ।
সোণার প্রতিমা গড়ি বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির।
বিদেশের স্ত্রীপুরুষ এ দেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে তারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে 'কি স্বদেশে কি বিদেশে—
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে'।"

তাই যদি হ'ল, যদি সনাতন শাস্ত্র-বলে, সমাজের গুণে, পুণ্যক্ষেত্রে, অতুল্য পতিব্রতা রমণী সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে জন্য আবার অভাগা হিন্দুর উপর এত গালি-গালাজ কেন ? এত শাঁপ-মন্যু কেন ? তাহাতেই আবার বলি স্বজাতি-প্রেমে হেমবাবু পৌঁছিতে পারেন নাই, বিজাতি-বৈর পর্য্যন্ত তাঁহার কবিত্বের সীমা।

কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, এই জাতি-বৈর হইতে স্বধর্ম্মানুরাগ আসিবে, নতুবা হেমচন্দ্রের কবিত্ব লইয়া, 'পণ্ড'শ্রম করিতাম না।

স্বধর্ম্মানুরাগ আসিবে, অথবা একটু আধটু আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই স্বধর্ম্মানুরাগের প্রতিপোষণই হেমচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি জাতি-বৈর-জাত কবিত্বের ভরে আমরা বানরের লাফালাফি শিখিয়াছি। এখনও আমরা সুগ্রীবের সহচর। এইবার আসুন শ্রীরামের আনুগত্য অবলম্বন করি, করিয়া স্বধর্ম্ম-উদ্ধারে যত্নবান্ হই। আসুন, বৃত্রসংহারের গূঢ় উপদেশ সকলে গ্রহণ করি। যাহাদের পশুবল মাত্র সম্বল, রাজসিক প্রকরণই প্রকরণ, তাহারাই, বলে—মার্‌কাট্, খায়—মালসাট্, খোলে—তলয়ার, ঝাড়ে—পাউডার। কিন্তু আমরা যতই কেন অবস্থান্তরিত হই না, এখনও দৈববলে বিশ্বাস করি; আভ্যন্তরিক বল কি, তাহা জানি ও বুঝি। আমাদের বল—তপস্যায়, সাধনায়; স্থৈর্য্যে, ধৈর্য্যে, সংযমে, বিশ্বাসে। ইন্দ্রের তপোব্রত, দধীচির হিতব্রত—উভয়ের সংযোগ না হইলে সাধনায় সিদ্ধি হয় না। আমরা সেই ব্রত গ্রহণ করিলেই, হেমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট কাব্যের স্মৃতি-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় গ্রহণ করা হইবে। তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৩০শে চৈত্র, ১৩১০।